# অন্ধকূপ-হত্যা রহস্য

মোহাম্মদ রুহুল আমিন

# অন্ধকূপ-হত্যা রহস্য

মোহাম্মদ রুহুল আমিন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

# প্রকাশকের কথা

বিশ্বব্যাপী সুদীর্ঘকাল ধরে বণিকের জাতি হিসেবে পরিচিত ব্রিটিশরা আঠারো শতকে এসে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। এর পরিণতিতে উনিশ শতকে এসে দেখা যায় এশিয়া ও আফ্রিকার এক বিরাট অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছে। তবে, ইতিহাস বলে ব্রিটিশদের এ সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজটি সহজে হয়নি। শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতাসহ বিভিন্ন অনৈতিক পন্থায় তারা নিজেদের দখল বিস্তার করে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে তারা এ পন্থায় নবাব সিরাজদ্দৌলাহ্‌র পতন ঘটায়। ইংরেজদের কূট-চক্রান্ত ও দেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় বীর, সাহসী, উদার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নবাবী বঞ্চিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, এদেশের মানুষের কাছে তার ভাব-মর্যাদা বিনষ্ট করার সম্ভাব্য সকল পন্থাই তারা গ্রহণ করে। তাঁর চরিত্র কলঙ্কিত করার জন্য যেসব বানোয়াট কাহিনীর অবতারণা করা হয় 'অন্ধকূপ হত্যা' কাহিনী তারই একটি। কলকাতা দুর্গের এক ইংরেজ সেনা হলওয়েল এ কাহিনীর স্রষ্টা। তার বর্ণনা অনুযায়ী ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন কলকাতা জয়ের পর নবাব সিরাজ ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে মাত্র ১৮ বর্গফুট আয়তনের একটি কক্ষে ঠাসাঠাসি করে বন্দী করে রাখেন। এর ফলে ঐ রাতেই ১২৩ জন ইংরেজের মৃত্যু হয়। ইংরেজরা এ ঘটনাকে 'ব্লাকহোল ট্রাজেডি' বা অন্ধকূপ হত্যা ঘটনা নামে আখ্যায়িত করে। কিন্তু পরবর্তীকালে নিরপেক্ষ বিচারে এ ঘটনার সত্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতার কোন প্রমাণ মেলেনি। ফলে ইংরেজদের এ ঘৃণ্য প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন ঐতিহাসিক, লেখক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। তার অনুসরণে আরো অনেকেই এ বিষয়ে অনুসন্ধান-গবেষণা করেছেন ও প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন।

মোহাম্মদ রুহুল আমীন-এর 'অন্ধকূপ হত্যা রহস্য' গ্রন্থটি অনুরূপ একটি প্রয়াস। লেখক এ গ্রন্থে এই বানোয়াট কাহিনীর আদ্যোপান্ত ঘটনা উল্লেখ এবং যুক্তি-তর্ক ও প্রমাণের ভিত্তিতে নবাব সিরাজদ্দৌলাহ্‌র উপর আরোপিত অপবাদ সম্পূর্ণ খণ্ডন, পাশাপাশি ইংরেজ চরিত্রের কুটিলতা-শঠতাও উন্মোচন করেছেন। এ গ্রন্থ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের স্বরূপ উন্মোচকও বটে। এ বিবেচনা থেকে ১৯৮১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়। পাঠকদের চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমানে এটি পুনঃ প্রকাশ করা হলো।

জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশনায় আমাদের প্রচেষ্টাকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কবুল করুন। আমীন।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

# সূচি

# দু'টি কথা

ইংরেজরা এ দেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে। কিন্তু এই সুজলা-সুফলা দেশে এসে তারা দেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এবং এদেশের সেনাপতি, রাজমন্ত্রী, ধনিক-বণিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাহচর্যে আসার পরই ইংরেজদের মনে দেশ দখলের বাসনা জাগে। তারা দেখলো, উপরতলার এসব লোকের কোন্দল, স্বার্থের হানাহানি আর অর্থের লালসার সুযোগে অনায়াসেই এদেশ দখল করা সম্ভব। এ সুযোগ তারা হাতছাড়া করলো না। কিন্তু দেশ দখল করেই তারা ক্ষান্ত থাকেনি। নিজেদের এই জঘন্যতম অন্যায় কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণের এবং স্বদেশবাসীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা রটালো নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে এমন সব কলংক-কাহিনী যার মধ্যে মিথ্যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এভাবেই তারা স্বদেশে-বিদেশে কলুষিত করেছে সিরাজ-চরিত্রকে এবং তাদের সেইসব রটনা শুনে অনেকে শিউরে উঠেছে সিরাজদ্দৌলার নামে। অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনী এসব রটনার একটি। কিন্তু মিথ্যার দিক থেকে এই কাহিনীর স্থান সবার উর্ধ্বে এবং এ কাহিনীই সিরাজ-চরিত্রকে কলংকিত করেছে সবচেয়ে বেশী। তাই এ সম্বন্ধে সত্য উদঘাটন করা নিতান্ত প্রয়োজন বলেই মনে করেছি। তাছাড়া আজ আমরা স্বাধীন আর আমাদের স্বাধীনতাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে। মীর জাফরের দল আবার সেই একই উদ্দেশ্যে মেতে উঠেছে। ফলে বহু কোরবানীর বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা আজ আবার বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে, জাতির এই দুর্দিনে অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীর রহস্যের মূলে যে বিদেশী চক্রান্ত ছিল, জাতিকে সে সম্পর্কে অবহিত করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই অলীক অন্ধকূপ কাহিনীর আসল কাহিনী বলার চেষ্টা করাই আমার আসল লক্ষ্য।

এ রচনায় ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র 'সিরাজদ্দৌলা' তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'পলাশীর যুদ্ধ কাব্য' এবং কয়েকজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের রচিত ইতিহাস থেকে বিশেষ সাহায্য নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব থেকে উপদেশ, সহানুভূতি এবং উৎসাহ পাওয়া গেছে। মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এঁদের মর্যাদাকে খাটো করতে চাই না। কেউ এ থেকে উপকৃত হলে শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

আর সঙ্গে সঙ্গে আরজ করবো। কেউ যদি এতে কোন ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করেন, তা সংশোধনে সহায়তা করলে বাধিত থাকবো।

# ভূমিকা

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর উপর রচিত জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমীন সাহেবের 'অন্ধকূপ-হত্যা রহস্য' একটি অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা। 'অন্ধকূপ হত্যার ন্যায় একটি কল্পিত কাহিনী নিয়ে বিদেশীরা বাংলার শেষ স্বাধীন অধিপতির নামে কুৎসা প্রচার করে এদেশের সমগ্র মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ মহিমা প্রচার এবং নিজেদের লোভ, স্বার্থপরতা ও অহমিকাকে প্রচ্ছন্ন রেখে অপর জাতির স্বাধীনতা হরণের জন্য হীন চক্রান্তে লিপ্ত হবার যৌক্তিকতা দেখানও যে 'অন্ধকূপ-হত্যা' কাহিনী আবিষ্কারের আরেকটি মূল উদ্দেশ্য ছিল, সেকথা এদেশী কেন, বিদেশী শ্বেতাঙ্গ ইতিহাসবিদরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এক সময় এই উপমহাদেশের কালো মানুষদের 'সভ্য' করার 'মহৎ' দায়িত্ব নাকি ইংরেজ কষ্ট করে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই মহত্ত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় তারা রেখে গেছে উদ্ভট ' অন্ধকূপ-হত্যা' কাহিনীর মাধ্যমে অন্য জাতিকে কলঙ্কিত করতে চেয়ে। 'অন্ধকূপ-হত্যা' কাহিনীর আসল সত্য উদ্ধারের জন্য এদেশের ইতিহাসবিদরা চেষ্টা করে সফল অনেকখানি হয়েছে। এঁদের মধ্যে পরলোকগত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রুহুল আমীন সাহেব তাঁর রচনায় মৈত্রেয় মহাশয়ের লেখার উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আরো দিলে ভাল হতো। এ ছাড়া বাংলাদেশের এবং ভারতের কয়েকজনের লেখা থেকেও যুক্তি তিনি দিয়েছেন। বিভিন্ন বইপত্র এবং ইংরেজ লেখক ও রাজকর্মচারীদের রিপোর্ট ও কাগজপত্র ঘেঁটে বেশ শ্রমসাধ্য উদ্যোগই নিয়েছেন রুহুল আমীন সাহেব। অবশ্য তাঁর এ প্রচেষ্টার মধ্যে কিছুটা ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়।

প্রথমত তা ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর সার্থকতা নিহিত থাকে মূলত তথ্যের মধ্যে। তত্ত্ব বা যুক্তি ইতিহাসে গৌণ। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর সত্যতা প্রমাণ ঐতিহাসিক তথ্য দিয়েই সার্থকভাবে করা যায়। আর এসব তথ্যের জন্য প্রধানত নির্ভর করতে হবে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও রাজপুরুষ ও লেখকদের রচনার উপরই। এই দিকটা বিবেচনা করে রুহুল আমীন সাহেব তৎকালীন ইতিহাসবিদ বিশেষ করে গোলাম হোসেন রচিত 'সিয়া আল মুতাক্ষ্খারীন' থেকে সিরাজ চরিত্রের বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে 'অন্ধকূপ-হত্যা' কাহিনী রচনার পেছনে যে সুচতুর উদ্দেশ্য আছে তা তুলে ধরতে পারতেন। তাছাড়া 'অন্ধকূপ-হত্যা'র মিথ্যার প্রতিবাদে যিনি প্রথমে সার্থকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন সেই পরলোকগত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁর রচনায় যে সমস্ত যুক্তি প্রদান করেছেন সেগুলো থেকে আরো উদ্ধৃতি দিলে ভাল হতো। ইতিহাস সম্পর্কে এক মনীষী বলেছেন, "ইতিহাস জাতির গৌরব ঘোষণার জন্য নহে, সত্য প্রকাশের জন্য" এই কথাটিকে সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হলে অনেক সত্যই উদ্ঘাটিত হবে।

এই রচনাটি সম্পর্কে আর যে একটি কথা বিশেষভাবে বলা দরকার, তা হলো এই যে, কোন প্রকাশনাকে সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজন পরিবেশনার দক্ষতা। পাঠকদের কাছে এই পরিবেশনার মাধ্যম হলো লেখকের ভাষা। সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রেখেই লেখক পরবর্তী রচনায় বাংলার শেষ স্বাধীন যুগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যবহুল আরো কিছু উপহার দিলে দেশ ও জাতি উপকৃতই হবে। জাতির কলঙ্ক দূর করার জন্য বইটির বহুল প্রচার আবশ্যক।

৩০/১০/৭০ মোহাম্মদ তোহা খান

# পরিচয়

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন অধিপতি নবাব মনসুর-উল-মুল্‌ক সিরাজদ্দৌলা শাহকুলী খাঁ মীর্জা মোহাম্মদ হায়বত জঙ্গ বাহাদুর। প্রজাবৎসল, শান্তস্বভাব, ন্যায়বান, বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দীর ইন্তেকালের পর ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি বাংলা বিহার উড়িষ্যার মসনদে আসীন হন। মসনদে বসেই দেখতে পান চারদিকে তিনি শত্রুবেষ্টিত। মীর জাফর, রায়দুর্লভ ইয়ার লতিফ প্রমুখ সেনাপতি, রাজবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ, জগৎশেঠ এবং উমিচাঁদ প্রমুখ প্রভাবশালী পাত্রমিত্র-পারিষদ ও পুঁজিপতি তাঁর ওপর খড়্গহস্ত এবং বিদেশী ইংরেজ বেনিয়াদের সাথে হাত মিলিয়ে রাতদিন ষড়যন্ত্রে মত্ত।

## অন্তিম উপদেশ

নবাব আলীবর্দী সবই জানতেন। তখন রোগক্লিষ্ট দুর্বল দেহ তাঁর। দৌহিত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন নবাব ক্রমশ আরো বেশী অবসন্ন হয়ে পড়ছিলেন। শায়িত অবস্থায় দৌহিত্র সিরাজকে কাছে ডেকে অন্তিম উপদেশ দিলেন। বললেন :

আমি শুধুমাত্র যুদ্ধের ময়দানে তলোয়ার হাতে জীবন যাপন করেই পার্থিব সংসার থেকে বিদায় নিচ্ছি। কিন্তু কার জন্য এত যুদ্ধ করলাম, কার জন্যই বা কুটনীতি ও বিচক্ষণতার সাথে রাজ্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছি? তোমার জন্যেই এসব আমি করেছি। আমার অবর্তমানে তোমাকে কিরূপ দুর্গতির মধ্যে পড়তে হবে, তা ভেবে কত না বিনিদ্র রজনী আমি কাটিয়েছি। এর কিছুই তোমার জানবার কথা নয়। আমার অভাবে কে কিভাবে তোমার সর্বনাশ সাধন করতে পারে সেসব কেবল আমারই জানা আছে।

হোসেন কুলী খাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। শওকত জঙ্গের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মেছিল, আজ হোসেন কুলী জীবিত থাকলে তোমার পথ কন্টকাকীর্ণ হতো ; কিন্তু হোসেন কুলী না থাকায় তোমার সে ভয়ও আর নেই।

দেওয়ান মানিকচাঁদ তোমার প্রবল শত্রু হয়ে উঠতো। সেজন্য আমি তাকে রাজপ্রাসাদ দিয়ে বশীভূত ও পরিতুষ্ট করে রেখেছি। এখন আর কি বলবো? আমার জীবনের অন্তিম কালের শেষ উপদেশ শোন ; ইউরোপীয় বণিকদের কিরূপ শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেদিকে কড়া নজর রেখো। তারাই তোমার প্রধান ভয়ের কারণ। আল্লাহ্ রহমানুর রহিম আমাকে আর কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখলে আমিই তোমার এ ভয় নির্মূল করে দিতাম। কিন্তু সে আশা আর নেই। এ কাজ এখন একা তোমাকেই করতে হবে।

এরা তেলেঙ্গা প্রদেশে যুদ্ধের ব্যাপারে নাক গলিয়ে যেরূপ কুটিলতার পরিচয় দিয়েছে, তা থেকেই তোমাকে সর্বদা হুঁশিয়ার থাকতে হবে। এরা এক দেশের লোকের গৃহ-বিবাদকে কাজে লাগিয়ে সে দেশ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে প্রজাগণের যথাসর্বস্ব লুটে নিয়েছে।

কিন্তু ইউরোপীয় বণিকদের সবাইকেই এক সঙ্গে পদানত করার চেষ্টা করো না। তাদের মধ্যে ইংরেজদেরই শক্তি বেড়েছে সবচেয়ে বেশী। সেদিন তারা আর এক দেশ জয় করে এসেছে। সুতরাং সবার আগে তাদেরকেই দমন করবে।

ইংরেজদেরকে দমন করতে পারলে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরাও আর মাথা তুলে উৎপাত করতে সাহস পাবে না। ইংরেজদেরকে কিছুতেই দুর্গ নির্মাণ কিংবা সেনা সংগ্রহের সুযোগ দিও না। যদি দাও, মনে রেখো, এদেশ আর তোমার থাকবে না।

(Ive's Journal)

## ইংরেজদের ঔদ্ধত্য

সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণের পর এই অন্তিম উপদেশের মর্ম প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন। ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ কখনো সিরাজের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন সিরাজের খালা ঘসেটী বেগমের নামে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবী করতে। সিরাজকে সিংহাসনে আরোহণ করতে দেখে দেওয়ানীর হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ভয়ে পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে লিখে দিলেন : "আর কি দেখিতেছ, ঢাকার ধনসম্পদ ও পরিবার লইয়া নৌকাপথে কলিকাতা অঞ্চলে পলায়ন কর।" (সিরাজদ্দৌলা– অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, পৃ. ১১২)

ইংরেজরা পরম সমাদরে কোলকাতায় কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দান করে। নবাবের বিনা অনুমতিতে দুর্গ সংস্কারে হাত দেয়। এতে সিরাজ ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। নবাব আলীবর্দীর অন্তিম বাণী তাঁর অন্তরে ভেসে উঠে। হলওয়েল সাহেবের কথায় যা হলো– His last advice to his grandson was to deprive the English of military power. (Hollwell's India Tracts)

অতঃপর নবাব কাশিম বাজারের ইংরেজ গোমস্তা ওয়াট্স্ সাহেবকে ডেকে পাঠান। ওয়াট্স্ নবাব দরবারে আসলে সিরাজ পরিষ্কার ভাষায় তাকে জানিয়ে দেন : "আমি তোমাদের ব্যবহারে মোটের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছি। শুনিলাম, তোমরা নাকি আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই কোলকাতার নিকটে দুর্গ নির্মাণ করিতেছ? আমি কিছুতেই এরূপ কার্যের প্রশ্রয় দিতে পারিব না। আমি তোমাদিগকে বণিক বলিয়াই জানি। যদি বণিকের ন্যায় শান্তভাবে বাস করিতে চাও, আমি তোমাদিগকে সমাজে আশ্রয় দান করিব। কিন্তু মনে রাখিও– আমিই এদেশের নবাব ; যদি দুর্গ-প্রাচীর চূর্ণ

করিতে ত্রুটি হয়, তবে কিছুতেই আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।" (সিরাজদ্দৌলা, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, পৃ. ১৩০-৩১)

ওয়াট্‌স্‌ সাহেব সিরাজের এসব কথার কোনই সদুত্তর দিতে পারেনি। সিরাজ ওয়াট্‌সের কাছে সদুত্তরের বৃথা আশা না করে কোলকাতায় ইংরেজ দরবারে খোজা ওয়াজিদ নামে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পাঠান। কিন্তু ইংরেজরা নবাবের পত্রের কোন উত্তর না দিয়ে এই সম্মানিত রাজদূতকেই অশেষ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে নগর থেকে বের করে দেয়।

"The messenger with a great deal of ignominy and turned him out of their bounds without any answer at all." (Hasting's MSS. Vol. 29, 209)

এতে সিরাজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। কোলকাতা কুঠির ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের উল্লেখ করে ইংরেজদেরকে তিনি লিখে পাঠালেন : "ইংরাজ গভর্নর ড্রেক সাহেব পত্র পাঠ ঐ সমস্ত সামরিক ঘাটি ভেঙ্গে না দিলে তিনি নিজে এসে ড্রেক সাহবকে ভাগীরথী নদীগর্ভে নিক্ষেপ করবেন।"

"That unless upon receipt of that order he (Mr. Drake) did not immediately begin and pull down those fortifications, he would come down himself and throw him in the river."— (Hasting's MSS—Vol. 29, 200)

এই পত্র পেয়ে ইংরেজরা যারপরনাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে কিন্তু তবুও তারা ধূর্ততা ছাড়ল না। মূল প্রসঙ্গের কোন উত্তর না দিয়ে ড্রেক সাহেব নবাবের কাছে লিখে পাঠালেন :

"That the Nabab been misinformed by those who had represented to him that the English were building a wall round the town, that they had no ditch since the invasion of the Marattas (মারাঠাবাসী) at which time such a work was executed at the request of the Indian inhabitants and with the knowledge and approbation of Alivardy; that in the late war between England and France, the French had attacked and taken the town of Madras, contrary to the neutrality, which it was expected would have been preserved in the Mogal's dominions and that they are being at present great apprehension of another war between the two nations, the English were under apprehensions that the French would act, in the same manner in

Bengal, to prevent which, they were repairing their line of guns on the bank of the river." (Orme-ii, 50-59).

এ থেকেই বোঝা যায়, ড্রেক সাহেব আসল সত্য চাপা দিয়ে নবাবের কাছে আরজ জানান যে, নবাবের নিকট সম্পূর্ণ ভুল তথ্যই পরিবেশন করা হয়েছে। ইংরেজরা কোলকাতায় কোন নগর-প্রাচীর রচনা করছে না, ফরাসীদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ বাঁধবার আশঙ্কায় নদীতীরের কামান বসানোর জায়গাগুলোই শুধু মেরামত করা হচ্ছে।

অথচ সেই সময় ইংরেজরা বাগবাজারের নিকট পেরিং নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করছিলো এবং দেশের নবাবের বিনা অনুমতিতে কোলকাতার দুর্গের সংস্কারে নিয়োজিত ছিলো। উদ্ধত ইংরেজের এই কুটিল ছলনা তীক্ষ্ণদর্শী সিরাজকে বিভ্রান্ত করতে পারল না। ড্রেক সাহেবের পত্র পেয়ে নবাব রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। "প্রেরিত দূতের অবমাননা ও দুর্গ নির্মাণ ব্যাপারে ইংরেজ অধ্যক্ষের প্রত্যুত্তর সিরাজদ্দৌলার ক্রোধ সঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট কারণ সন্দেহ নাই।"

(নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়)

অতএব আর চুপ করে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। ইংরেজ বণিকের এই ধৃষ্টতার সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য নবাব ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে মে জমাদার উমর বেগকে তিন হাজার সৈন্যসহ কাশিম বাজার পাঠান।

পরদিন আরো দু'শো অশ্বারোহী, কিছু সংখ্যক বরকন্দাজ ও দুটি সুশিক্ষিত যুদ্ধহস্তী উমর বেগের সৈন্যদলের সঙ্গে এসে মিলিত হয়। এতে ইংরেজদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায় এবং ওয়াট্‌স্ সাহেব আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেন। ডাক্তার ফোর্থকে ব্যাপার জানার জন্যে উমর বেগের নিকট পাঠানো হয়। উমর বেগ ডাক্তার ফোর্থকে জানালেন, ওয়াট্‌স্ সাহেবকে নবাবের দরবারে নেয়ার জন্যেই তিনি এসেছেন। ওয়াট্‌স্ সাহেব সেখানে গিয়ে একখানি মুচলেকানামা লিখে দিলেই সব গোলমাল মিটে যাবে। অন্যথায় তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। সুচতুর ওয়াট্‌স্ ভেবে চিন্তে ফন্দী আঁটে। "নবাবের আদেশের অপেক্ষায় আছি" – একটি আবেদনপত্রে এই কথা লিখে সে নবাবের কাছে পাঠিয়ে দেয়। উত্তর এলো "দুর্গ প্রাকার চূর্ণ করে ফেলো ; এটাই নবাবের আদেশ।" ইংরেজরা নবাবের কাছ থেকে এমন উত্তর আশা করেনি। তারা মনে করেছিল সিরাজের বোধ হয় অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেজন্য প্রচুর উৎকোচ দিয়ে তারা নবাবের কিছু পাত্রমিত্রকে হাত করলো কিন্তু তাদের দ্বারা বিশেষ কিছু লাভ হলো না। অনন্যোপায় হয়ে ইংরেজরা দেওয়ান রাজবল্লভকে ধরলো। রাজবল্লভ বললেন যে, ওয়াট্‌স্ সাহেব হাতে রুমাল বেঁধে হীনবেশে নবাব দরবারে হাযির হতে সাহসী হলে তিনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ওয়াট্‌স্ তাতেই রাজী। সিরাজদ্দৌলার দরবারে হাযির হওয়া মাত্র নবাব ওয়াট্‌স্‌কে তাদের উদ্ধত ব্যবহারের জন্য ভর্ৎসনা করলেন এবং পরিশেষে তাকে

মুচলেকা পত্রে স্বাক্ষর করার নির্দেশ দিলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত ওয়াট্স্ কম্পিত হাতে মুচলেকা পত্রে স্বাক্ষর দিয়ে প্রাণ বাঁচালো। মুচলেকায় লেখা ছিল : "কোলকাতার নবনির্মিত পেরিং দুর্গ প্রাকার ভেঙ্গে ফেলতে হবে, নবাবের যেসব কর্মচারী দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কোলকাতায় পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে তাদেরকে বেঁধে নবাবের দরবারে হাযির করে দিতে হবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার জন্য যে বাদশাহী সনদ পেয়েছে তার দোহাই দিয়ে অন্যান্য ইংরেজও বিনা শুল্কে বাণিজ্য চালিয়ে রাজকোষের যত ক্ষতি সাধন করছে, তা পূরণ করতে হবে। কোলকাতার জমিদার হলওয়েল সাহেবের ক্ষমতার দাপটে এদেশীয় প্রজাগণ যেসব নির্যাতন সহ্য করছে, তা বন্ধ করতে হবে।" (Hasting's MSS.—Vol. 29, 209.)

এই মুচলেকা পত্রে সিরাজদ্দৌলার দৃঢ় চরিত্রবল, বিচক্ষণ শাসন কৌশল ও অনুপম প্রজাহিতৈষণার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুন মুচলেকা পত্র স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর কাশিম বাজারের ইংরেজ দুর্গ সিরাজদ্দৌলার দখলে যাওয়ার ক্ষোভে ইংরেজ সেনাপতি লেঃ ইলিয়ট আত্মহত্যা করে এবং ওয়াট্স্ ও চেম্বার্স মুচলেকা পালনের প্রতিভূস্বরূপ মুর্শিদাবাদে থাকতে বাধ্য হয়।

কোলকাতার ইংরেজ দরবারই যে এদেশে ইংরেজদের সবচেয়ে বেশী ক্ষমতার অধিকারী, এটা নবাবের জানা ছিল। তাই কোলকাতা থেকে ওয়াট্স্ স্বাক্ষরিত মুচলেকা পত্রের স্বীকৃতি আদায়ের জন্যই সিরাজ ওয়াট্স্ ও চেম্বার্সকে মুর্শিদাবাদে আটক করে রাখেন। কিন্তু অনেক সময় পাওয়া সত্ত্বেও কোলকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মুচলেকা সম্বন্ধে নবাবকে কোন মতামতই জানালো না। এদিকে সিরাজদ্দৌলার মায়ের সঙ্গে ওয়াট্সের স্ত্রীর সখ্যতার সুযোগে মিসেস ওয়াট্স্ নবাব হেরেমে অবাধে যাতায়াত করতে থাকে এবং দারুণ কান্নাকাটিতে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। করুণাময়ী মাতা সিরাজকে বন্দীদ্বয়ের মুক্তি দিতে বললেন। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিরাজ মায়ের আদেশে শেষ পর্যন্ত ওয়াট্স্ ও চেম্বার্সকে মুক্তি দেন। অবশ্য মুক্তিদানকালে তিনি মিসেস ওয়াট্সের কাছ থেকে মুচলেকা পালনের ওয়াদা লিখিয়ে নেন।

## নবাবের কোলকাতা অভিযান

অল্প দিনের মধ্যেই সিরাজদ্দৌলা শুনতে পেলেন যে, ইংরেজরা মুচলেকা পালন করতে ইচ্ছুক নয়। এ যাবত সিরাজ ইংরেজদের অনেক অন্যায় আচরণ সহ্য করেছেন– আর সহ্য করতে পারলেন না। সেই অন্তিম উপদেশ আবার তাঁর মানস-পটে ভেসে উঠলো। এ সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকগণ

যাহাই বলুন, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ইংরেজ কর্মচারিগণের হঠকারিতায় ক্রমাগত উত্যক্ত হইয়াই সিরাজদ্দৌলা ইংরেজ উৎখাতে বদ্ধপরিকর হন।" (নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃ. ২০৫)

সিরাজদ্দৌলা বাধ্য হয়ে সসৈন্যে কোলকাতার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। রোজার ড্রেক তখন কোলকাতার গভর্নর। ৭ই জুন ভোরে তিনি খবর পেলেন– নবাব সসৈন্যে কোলকাতার দিকে আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঢাকা, বালেশ্বর, জগদীয়া প্রভৃতি স্থানের ইংরেজ কর্মচারীদেরকে লিখে পাঠালেন সকল তহবিল পত্র নিয়ে অবিলম্বে সরে পড়তে। এদিকে নগর রক্ষার মানসে ড্রেক নিজে সৈন্য সংগ্রহে উদ্যোগী হলেন। উদ্ধত ব্যবহারের জন্য নবাবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার পরিবর্তে ইংরেজরা প্রাণপণে আত্মরক্ষারই আয়োজন করতে লাগলো। বাগবাজার পেরিং দুর্গ বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে সাজানো হলো, ভাগীরথী নদীতে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করা হলো, দেড় হাজার ঠিকা সিপাহী নিযুক্ত হলো, দুর্গমধ্যে খাদ্য ও পানীয় মজুদ করে রাখা হলো, মাদ্রাজে সাহায্য চাওয়া হলো, ওলন্দাজ ও ফরাসীদের কাছে সাহায্যের জন্য দূত ছুটলো। এর মধ্যে ইংরেজরা খবর পেল সিরাজদ্দৌলা অর্ধেক পথ এসে গেছেন এবং সঙ্গে আছেন মীর জাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মানিকচাঁদ প্রমুখ সেনাপতি ও অন্যান্য অমাত্য। ইংরেজদের সাহস ও ঔদ্ধত্য এ সময় হ্রাস না হয়ে আরো বেশী করেই প্রকাশ পেয়ে চললো। তারা কোলকাতার আড়াই মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে নবাবের ক্ষুদ্র দুর্গ 'টানা' আক্রমণ করে বসলো। দিনটি ছিল ১৩ই জুন। চারখানা যুদ্ধজাহাজ থেকে নবাবের এই অরক্ষিত দুর্গ লক্ষ্য করে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে তারা দুর্গশীর্ষে নিজেদের বিজয় পতাকা উড়ানোর মত দুঃসাহস দেখালো।

এই খবর পাওয়া মাত্র হুগলীর ফৌজদার দুর্গ পুনরুদ্ধারের জন্য সৈন্য পাঠান। ১৪ই জুন নবাব সৈন্যরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করতে করতে দুর্গদ্বারে এসে উপস্থিত হয়। ভয়ে ইংরেজ রাজপুরুষরা পালিয়ে গিয়েও সবাই নিস্তার পেলো না। নবাব সেনা মুষলধারায় গুলীবর্ষণ করে তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। কোলকাতা থেকে আরো বহু ইংরেজ সেনা এসে যোগ দিলেও নবাবের সিপাহীদের সঙ্গে তারা এঁটে উঠলো না। বিফল মনোরথ হয়ে ভগ্নহৃদয়ে ইংরেজরা নোঙ্গর তুলে, জাহাজ খুলে কোলকাতায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। (Orme, Vol. ii, 50, 60)

এর মধ্যে ইংরেজরা তাদের আশ্রিত কৃষ্ণবল্লভকে সন্দেহপরবশ হয়ে কারারুদ্ধ করে। উমিচাঁদকে কোলকাতার রাজপথ দিয়ে টেনে নিয়ে বন্দী করা হয় এবং ইংরেজ সেনা তার বাসভবন অবরোধ করে রাখে। উমিচাঁদের বরকন্দাজ ও ভৃত্যদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে। পরিশেষে বিজয়ী বেশে ইংরেজ সেনা তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে থাকে। তাদের হাতে অপমান ও নির্যাতনের ভয়ে উমিচাঁদের বৃদ্ধ ভক্ত জমাদার

জগন্নাথ অন্তঃপুরে চিতাকুণ্ড জ্বালায় এবং প্রায় ৩০ জন মহিলার মস্তক কেটে চিতায় নিক্ষেপ করে উমিচাঁদের পরিবারের মান বাঁচায়। এর ফলে ফিরিঙ্গীদের লালসা ও কামনা অতৃপ্ত রয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে জগন্নাথ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

বেনিয়া ইংরেজদের ঔদ্ধত্য চরম সীমায় পৌঁছতে দেখে সিরাজদ্দৌলার ধৈর্যের বাঁধও ভেঙ্গে যায়। ইংরেজদেরকে সমুচিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে সিরাজ সসৈন্যে কোলকাতায় হাযির হলেন। যাঁর নাম তাদের পাপ-মনে আতঙ্ক জাগায় সেই সিরাজকে নিজেদের কুঠিপ্রান্তে দেখে ইংরেজরা ভয়ে জড়সড় হয়ে উঠে এবং শহরে তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি হয়। ভীত-সন্ত্রস্ত ইংরেজ নরনারী দুর্গের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের নগর রক্ষার সগর্ব আস্ফালনও স্তিমিত হয়ে আসে। নবাবের মন পাবার জন্য ইংরেজরা কৌশলজাল বিস্তারের সকল চেষ্টাই চালায়। কিন্তু অর্থের প্রলোভন, উৎকোচ, উপঢৌকন, কাকুতি-মিনতি কোন কিছুই সিরাজকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি। অবশেষে বাধ্য হয়ে কোলকাতা রক্ষার জন্য ইংরেজ সেনারা আপন আপন সঙ্কেত ভূমিতে এসে জমায়েত হতে থাকে।

দুর্গ রক্ষার জন্য যাদের মোতায়েন করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে সেনাপতি ও সৈন্য মিলিয়ে ৬০ জনের বেশী ইউরোপীয় ছিল না।

> "The troops in garison consisted, by the master rolls laid before us about the 6th or 8th of June, of 145 in battalion and 45 of the trained officers included, in both only 60 Europeans." (Hollwell's India Tracts, p. 302)

এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই ইংরেজরা দুর্গ রক্ষার দুঃসাহস দেখায়। এজন্যেই চরম উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও প্রতি মুহূর্তের পরাজয়-চিন্তা ইংরেজ সেনাদেরকে বিনিদ্র রজনী যাপনে বাধ্য করে।

ইংরেজ নরনারী যে দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এবং যে দুর্গ রক্ষার জন্য ইংরেজ বীর যোদ্ধারা এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল ইতিহাসে তা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নামে পরিচিত। এই দুর্গের পশ্চিম সীমানা দিয়ে প্রবাহিত ভাগীরথী নদী। পূর্বদিকে সুপ্রশস্ত রাজপথ। দুর্গ রক্ষার জন্য ইংরেজেরা পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ এ তিন দিকে তিনটি তোপ স্থাপন করে। এ সকল তোপের গোলাবর্ষণের মধ্যে দুর্গে প্রবেশ করা সিরাজের সাধ্যের অতীত– এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ইংরেজদের অনেকেই দুর্গমধ্যে আশ্রয় নেয়। আবার কেউ কেউ জরাজীর্ণ দুর্গ-প্রাচীর, অপ্রচুর গোলা-বারুদ এবং খাদ্যের অভাব প্রভৃতির দোহাই পেড়ে ভীত চকিত মনে অন্যত্র পালিয়ে যায়।

১৮ই জুন প্রত্যূষে নবাব সেনা কামানে অগ্নি সংযোগ করে। ইংরেজ সেনা বা জাহাজ ও পেরিং দুর্গ থেকে পাল্টা জবাব দেয় গোলাবর্ষণ করে এবং আক্রমণ প্রতিহত

করার চেষ্টা চালায়। এ পাল্টা গোলা বর্ষণের মুখে নবাব সেনা সামনে অগ্রসর হতে না পারলেও কয়েকজন সিপাহী গোপনে সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু পিসকার্ড নামে জনৈক ইংরেজ সৈন্য অন্ধকারের মধ্যেও তাদের ধরে ফেলে এবং কেটে টুক্‌রো টুকরো করে দেয়। ইংরেজরা স্বদেশীয়ের কৃতিত্বে উল্লাসে ফেটে পড়ে।

## নগরের গোপন পথে

ইংরেজদের তোপের গোলা অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হওয়া সিরাজের সৈন্যদের পক্ষে দীর্ঘক্ষণ সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে উমিচাঁদের আহত বৃদ্ধ জমাদার জগন্নাথ পালিয়ে এসে নবাব শিবিরে আশ্রয় নেয় এবং সিরাজদ্দৌলার নিকট উমিচাঁদের উপর ইংরেজদের নির্যাতন, তাঁর অন্তঃপুরে অবলাদের করুণ পরিণতির কাহিনী জানিয়ে দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে নগর আক্রমণের গোপন পথের সন্ধান দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে নবাব বাহিনী রণকৌশল পরিবর্তন করে উত্তর দিক থেকে গোলাবর্ষণ বন্ধ রেখে পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে মুষলধারে তোপের অগ্নিবর্ষণ করতে থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের ইংরেজ রক্ষী সেনাদলকে পর্যুদস্ত করে নবাব সেনা একটু সরে আসে এবং পরক্ষণে হঠাৎ সাঁড়াশী ব্যূহ রচনা করে তড়িৎবেগে ও প্রবল বিক্রমে ইংরেজদের তিনটি তোপই তিন দিক থেকে বেষ্টন করে তীব্র আঘাত হানতে থাকে। গতিক দেখে পূর্বদিকের তোপের গোলন্দাজ দলের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ক্লেটন এবং তাঁর সহকারী হলওয়েল সাহেব দুর্গাভ্যন্তরে পালিয়ে যান এবং নবাব সেনা ইংরেজদের তোপমঞ্চ দখল করে নেয়। পরে সেই দখল করা তোপের সাহায্যেই নবাবের ফৌজ ইংরেজ সেনা দুর্গের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করতে থাকে। যুদ্ধের এই আকস্মিক পটপরিবর্তনে ইংরেজরা পর্যুদস্ত হয় এবং তাদের সাধের কোলকাতা কেঁপে উঠে।

রাত দু'টোর সময় ইংরেজ সেনা-সামন্ত ও অন্যরা এক সভায় মিলিত হয়ে গভীরভাবে পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা করে। বহু তর্ক-বিতর্কের পর অধিকাংশের অভিমত অনুযায়ী পরিশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় : "দুর্গ রক্ষার জন্য আর চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম ও অনাবশ্যক। নগদ অর্থ ও রত্ন-সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যাওয়াই বিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে।" (Orme—Vol. ii.p-69) পালিয়ে যেতে হবে ঠিকই। কিন্তু কখন, কিভাবে ও কোন্ পথে পালিয়ে যাওয়া যায় তার কোনই সুরাহা হয়নি।

ভোর হওয়ার সাথে সাথে ভাগীরথী তীরে মহা হুলস্থূল পড়ে যায়। নৌকাযোগে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ইংরেজ নরনারী সকলেই নদীতীরে এসে জমায়েত হয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে। সবাই সবার আগে জাহাজে ওঠার জন্য ব্যস্ত-সমস্ত। এই

তাড়াহুড়ার ফলে কেউ কেউ নৌকা উল্টে পানিতে ডুবে যায়, কেউ কেউ নবাব সেনার গুলী ও তীরের আঘাতে লুটিয়ে পড়ে। অবশ্য কিছু লোক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অবশিষ্ট কয়েকজন ইংরেজ দুর্গমধ্যে আটকে পড়ে। যারা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয় তাদের মধ্যে গভর্নর ড্রেক, মিঃ ম্যাকেট, সেনাপতি মিনচিন ও ক্যাপ্টেন গ্রান্ট ছিলেন অন্যতম।

## অন্ধকূপ-হত্যা

২০শে জুন প্রত্যুষে নবাবী ফৌজ দলে দলে এসে দুর্গের চারদিকে জমায়েত হতে শুরু করে। ভীত-সন্ত্রস্ত দুর্গবাসী ইংরেজরা নবাবের নিকট আত্মসমর্পণের জন্য হলওয়েলকে বারবার চাপ দিতে থাকে। হলওয়েল অনন্যোপায় হয়ে রোরুদ্যমান অবস্থায় উমিচাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করে। ইংরেজদের কাতর ভাব দেখে উমিচাঁদ তাঁর নিজের উপর যে নির্যাতন হয়েছিল সে কথা এবং পরিজন হারানোর ব্যথা ভুলে যান এবং ইংরেজদের দরদী হয়ে ওঠেন। ফলে তাদের পক্ষ হয়ে নবাবের অনুগ্রহ চেয়ে নবাব সেনাপতি মানিকচাঁদের কাছে একখানা পত্র লিখেন। কিন্তু সে পত্র মানিকচাঁদের হাতে পৌছার আগেই অন্যের হস্তগত হয়ে যায়। হলওয়েল পত্রের কোনরূপ উত্তর না পেয়ে আবার সৈন্য সংগ্রহে চেষ্টিত হতে থাকে। এমন সময় অসন্তুষ্ট ও অবরুদ্ধ ইংরেজ সেনা পশ্চিম দিকের দুর্গদ্বার খুলে দেয় এবং সেই দরজা দিয়েই স্রোতবেগে নবাব সেনা দুর্গে প্রবেশ করে। দুর্গবাসী সকল ইংরেজই বন্দী হয় এবং দুর্গের উপর সিরাজদ্দৌলার বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়।

বিকেলে সেনাপতি মীর জাফর আলী খাঁ এবং অন্যান্য পাত্র-মিত্রসহ নবাব দুর্গে প্রবেশ করে এক দরবার বসালেন এবং উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে খোঁজ করার নির্দেশ দিলেন। তারা উভয়েই সশঙ্ক চিত্তে দরবারে হাযির হয়। কিন্তু সিরাজ তাদেরকে যথাযথ সম্মান দেখিয়ে যথোচিত আসনে বসান এবং তাদের সব অপরাধ মাফ করে দেন।

ইংরেজরা ছিল যুদ্ধবন্দী। সুতরাং বন্দীবেশেই তাদেরকে নবাব-দরবারে হাযির করা হয়। হলওয়েলও বন্দীদের মধ্যে ছিল। সিরাজদ্দৌলা তার বন্ধন মোচনের নির্দেশ দেওয়ায় তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। সিরাজ ইংরেজদেরকে সবরকমের অভয় দান করেন। তারা চলে যায় ; অতঃপর দরবার ভেঙ্গে যায়। সেনাপতি মানিকচাঁদের ওপর দুর্গের শাসনভার দিয়ে সিরাজদ্দৌলা আরাম ভবনে গিয়ে বিশ্রাম নেন। অথচ এ ঘটনাটিকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ইংরেজ ইতিহাসবিদগণ বলেন, যেসব ইংরেজ আত্মসমর্পণ করে বন্দী হয়েছিল, সেসব ইংরেজ নরনারী গভীর রাতে ক্ষুদ্রায়তন কারাকক্ষে নিদারুণ যাতনায় ছটফট করতে থাকে এবং তাদের অনেকেই মরে যায়। ফলতঃ ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এ বন্দী-মৃত্যুরই নাম দিয়েছিলেন 'অন্ধকূপ-হত্যা'। কিন্তু 'অন্ধকূপ-হত্যার' এই অলীক কাহিনীই যে সিরাজ-চরিত্রকে কলংকিত করে দেখানোর অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়, তা কে না জানে।

## অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনী রচনার পটভূমি

অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনীর মূল হোতা হলওয়েল সাহেব। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে 'সাইরেন' পোতযোগে বিলেত যাত্রাকালে প্রিয় বন্ধু উইলিয়াম ডেভিসের নিকট এক পত্র লেখেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত হলওয়েলের এই বিরাটাকার পত্রেই আমরা অন্ধকূপ-হত্যার প্রথম এবং শেষ বিস্তারিত বিবরণ পাই। প্রকৃত ঘটনার সত্যাসত্য আলোচনা ও যাচাই করার আগে হলওয়েল সাহেবের লেখা পত্রটি কিছু কিছু জানা প্রয়োজন। হলওয়েল সাহেবের লেখা পত্রের কাহিনী হলো– "বাংলার ইতিহাস পড়ে মানুষ জেনে রাখবে যে, ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুনের সেই মর্মান্তিক নিশীথে ১৪৬ জন বন্দীর মধ্যে ১২৩ জন হতভাগাই অন্ধকূপে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল। কেমন করে এই সর্বনাশ সংঘটিত হলো, তার যথাযথ বর্ণনা দিতে সক্ষম, এমন অল্প লোকই প্রাণ নিয়ে ফিরেছে। যাঁরা একটু চেষ্টা করলে এ সম্পর্কে অন্তত কিছুটা লিখে যেতে পারতেন, তাঁরা পর্যন্ত সেই মর্মান্তিক ও শোচনীয় কাহিনীটি লিখেন নি– লেখার চেষ্টাও করেন নি।

অবশ্য অন্ধকূপের কথা লেখার আগে এর পটভূমিকা হিসাবে কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। বিকেল ৬টায় নবাব ও তাঁর সেনাদল দুর্গে প্রবেশ করেন। আমার সাথে সেদিন নবাবের তিন-তিনবার সাক্ষাত হয়। সাতটার একটু আগে শেষ দেখা। তখনো তিনি এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, তিনিও একজন বীর-পুরুষ এবং বীর পুরুষের ন্যায়ই বলছেন, 'আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।' আমার এখনো এ বিশ্বাস অটুট রয়েছে যে, নিতান্ত সাধারণ হুকুম দান ছাড়া আমাদেরকে কোথায় রাখতে হবে, কেমন করে রাখতে হবে– এসব কিছুই সিরাজদ্দৌলা বলে দেন নি। আমরা যেন পালিয়ে যেতে না পারি এমন ব্যবস্থা করতে হবে, এতটুকুই বলে থাকবেন। আমাদের এই ধারণা, এই ক'দিনের যুদ্ধে যারা মারা গিয়েছিল, তাদের সহকারী সিপাহিগণই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আমাদের এরূপ দুর্গতি করেছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে একজন প্রহরীর আগমন ঘটে এবং প্রশস্ত বারান্দার খিলানের কাছে সে আমাদেরকে বসতে বলে, এটাই হলো অন্ধকূপ কারাগার। চৌকির পশ্চিম দিকে অবস্থিত এই কারাগারের সামনে ছিল ময়দান আর সেখানে প্রজ্বলিত মশাল হাতে দাঁড়িয়েছিল চার-পাঁচ শ' গোলন্দাজ।

চেয়ে দেখলাম, চারদিকেই আগুন জ্বলছে। ভীষণ ভয় হলো। সকলেই ভাবলেন, আমাদেরকে পুড়িয়ে মারার জন্যেই বোধ হয় এত লোক মশাল নিয়ে অপেক্ষা করছে। সাড়ে সাতটার সময় কয়েকজন সেনানায়ক মশাল হাতে প্রাচীর সংলগ্ন কক্ষগুলো তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলেন। এসব দেখে আর কোন সন্দেহের অবকাশই রইল না।

মনে হলো, বুঝিবা আমাদের ধারণাই ঠিক হতে চলেছে। সবাই ভেবে অস্থির হয়ে উঠলাম। ধরে নিলাম, এসব সৈন্য-সামন্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব ছারখার করার মানসেই নিকটস্থ কক্ষগুলোয় অগ্নি-সংযোগ করতে আসছে। এই অবস্থায় সকলেই স্থির করলাম– আর নয়, এবার প্রহরীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ঢাল তলোয়ার কেড়ে নেব আর সামনে যে-সকল গোলন্দাজ দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে সদর্পে আক্রমণ করে বীরের ন্যায় জীবন বিসর্জন দেবো, ভীরু ও কাপুরুষের মতো আগুনে পুড়ে মরতে আমরা প্রস্তুত নই। বেইলী জেন্‌কিন্‌স্ ও রেভেলী বললেন, 'হঠাৎ করে এতবড় দুঃসাহসের কাজ করে কি কোন সুবিধা হবে? তার-চাইতে বরং আগে ব্যাপার কি তা দেখে এসো।' কিন্তু আমি উঠে গিয়ে যা দেখলাম তাতে সব ভুল আমাদের ভেঙে গেল। রাতে আমাদেরকে কোথায় থাকতে হবে, তা স্থির করার জন্য প্রহরীর খোঁজ করছিল, পুড়িয়ে মারার জন্য নয়। আরো দেখি, প্রহরী-ব্যারাকের ঘরগুলোর মধ্যেও অনুসন্ধান করে চলছে।

এখানে একজন লোকের পরিচয় দিয়ে রাখি, নাম লিচ্। ইনি কোম্পানীর কোলকাতা কুঠির কর্মচারী ছিলেন। আগে একে কেবল বন্ধু হিসেবেই সাধারণভাবে সমাদর করতাম। এই বন্ধুটির সেদিনকার অপূর্ব ব্যবহার যে অধিকতর সমাদরের অপেক্ষা রাখে তা সেদিনই বুঝেছিলাম।

মুসলমানরা যে সময় তুমুল কোলাহল করে দুর্গে প্রবেশ করছিল, লিচ্ সেই সুযোগে পালিয়ে আত্মগোপন করছিলেন। পরে আঁধারের মধ্যে ফিরে এসে তিনি চুপি চুপি আমাকে বললেন যে, তিনি নদী-তীরে নৌকা প্রস্তুত করে রেখে এসেছেন। আমি পালিয়ে যেতে রাজী আছি কিনা? শুধুমাত্র এটুকু জানার জন্যই যে গোপন পথে তিনি দুর্গে প্রবেশ করেছেন, তা ধারণারও অতীত ছিল। এ সময় আমাদের কাছে পাহারাদারের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। যে ক'জন ছিল তারাও সহজ-সরল মনে দূরে দূরে পায়চারী করছিল। ইচ্ছা থাকলে অনায়াসেই আমি পালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু যাঁরা আমারই নির্দেশে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুর্গ রক্ষার জন্য প্রাণপণে লড়েছেন এবং পরিশেষে শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছেন, তাঁদেরকে অসহায় অবস্থায় নবাবের হাতে রেখে একাকী প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে আমার মন চায়নি। আমার মনের কথাটা জানতে পেরে লিচ্ বলেছিলেন যে, কেবল আমার জন্যই তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন ; আমিই যদি না পালাই তবে তিনিই বা কেন একাকী পালিয়ে নিজের জান বাঁচাবেন? সুতরাং শেষ পর্যন্ত কারোই আর পালিয়ে যাওয়া হল না। প্রহরীদের মধ্যে যারা স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তারা এসে ব্যারাকের বাম পাশের ঘরে প্রবেশ করবার জন্য আমাদিগকে হুকুম দিতে লাগলো। ব্যারাকে কতকগুলো তক্তপোষ ছিল। সিপাহীদের শোবার জন্যই এগুলো রাখা হয়েছিল। ঘরে বাতাস চলাচলেরও সুব্যবস্থা ছিল। ভাবলাম, সারাদিনের রণক্লান্তি দূর করবার হয়তো বা

একটা উপায় হলো। তাই প্রবল আগ্রহ ভরেই সকলে ঘরে ঢুকতে লাগলাম। এ ব্যারাকের ভেতর দিয়েই ছিল অন্ধকূপ কারাগারের প্রবেশদ্বার। কয়েকজন সিপাহী বন্দুক উঁচিয়ে আমাদেরকে সেই অন্ধকূপে ঢোকার জন্য ইঙ্গিত করলো। নিরস্ত্র অবস্থায় সে ইঙ্গিত অমান্য করার সাহস আমাদের হয়নি। যারা পিছনে ছিল তারাও প্রবল বেগে সামনে ঠেলে দিচ্ছিলো। সামনের ঢেউ যেমন পশ্চাতের ঢেউয়ের আঘাতে কেবল সামনের দিকেই ধেয়ে চলে, তেমনি আমরাও তাড়াতাড়ি ধাক্কাধাক্কি করে অন্ধকূপের মধ্যে ঢুকতে লাগলাম। সে অন্ধকূপ যে এত ক্ষুদ্র পরিসরের, তা জানতাম না। আমি কেন, দু' একজন সৈন্য ছাড়া আর কেউ-ই তা জানতেন না। যদি জানতাম যে, সত্যি-সত্যিই ঘরটি অন্ধকূপ ছাড়া কিছুই নয়, তাতে না ঢুকে বরং আদেশ অমান্য করে প্রহরীদের হাতেই জীবন বিসর্জন দিতাম।

আমিই সকলের আগে প্রবেশ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বেইলী জেন্‌কিন্‌স্ কুক্, কোলস্, স্কট, রেভিলি এবং বুকানন্‌ও ঢুকলেন। দরজার কাছেই জানালা। ভিতরে ঢোকার পর আমি সেই জানালার ধারে আশ্রয় পেলাম। কোলস্ এবং স্কট দু'জনেই ছিল আহত। অবস্থা দেখে তাঁদের দু'জনকেও আমার কাছে ডেকে আনলাম। অন্য সবাই আমাদের আশে-পাশে যে যেখানে পারল ঘিরে দাঁড়াতে লাগলো। দরজা যখন বন্ধ হলো, রাত তখন আটটা বেজে গেছে।

ঘোর অন্ধকার রাত। ১৮ ফুট আয়তনের একটি ক্ষুদ্র কক্ষ। বাতাসের চলাচল সেখানে সম্পূর্ণ বন্ধ। একটি মাত্র দরজা, তা-ও আবার উত্তর দিকে। ঘরের দুটিমাত্র জানালাও লৌহশলাকা বেষ্টিত। একটু ঠাণ্ডা বাতাস পাওয়ারও উপায় নেই। এমনি একটি কক্ষেই রণ-পরিশ্রান্ত এক'শ ছেচল্লিশ জন হতভাগা বন্দীর স্থান হয়েছিল। এই অবস্থার কথা কল্পনা করে নিলে আমাদের চরম দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে আংশিকভাবে উপলব্ধি করা সহজতর হবে।

আমাদের জন্য আরো অনেক দুর্গতি অপেক্ষা করছিল। ভবিষ্যতের সেই অবস্থা যেন ভয়াবহ রূপ ধরে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। কারাকক্ষের আয়তন দেখেই আমাদের চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল। সবাই মিলে মরিয়া হয়ে কারার রুদ্ধ দুয়ার ভেঙ্গে ফেলার জন্য চেষ্টা করলো। কিন্তু তাদের সে বিপুল প্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল হলো। কারার দরজা খুললো না।

ক্রুদ্ধ বন্দীরা সবাই মিলে উন্মত্তের মতো বৃথা আস্ফালন করতে লাগলো। আমি বুঝলাম, সে নিষ্ফল ক্রোধ শীঘ্রই তাদের দেহমনকে অল্পকালের মধ্যেই অবসন্ন করবে ও গুঁড়িয়ে দেবে। তাই সবাইকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলাম, তারা যেন স্থির শান্ত হয়ে থাকে।

সকলে শান্ত হলো। অতঃপর কি করা কর্তব্য– তাই যখন চিন্তা করার চেষ্টা করছি, এমনি সময় শুনতে পেলাম, পাশের আহত বন্ধুদ্বয় মৃত্যু-যাতনায় বিকট আর্তনাদ করছেন। এ পর্যন্ত বহুবার মানুষকে নানাভাবে মরতে দেখেছি। প্রায়শ মৃত্যুকাহিনী আলোচনাও করেছি। কাজেই কল্পনায় মৃত্যুছবি আমার কাছে নতুন কিছু ছিল না। নিজের প্রাণের জন্য ভয় আমার হয়নি। কিন্তু সহযোগীদের মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখে সেদিন আর স্থির থাকতে পারিনি।

পাহারাদারদের মধ্যে একজন বুড়ো জমাদার ছিল। তাকে দেখে মনে হলো, সে যেন আমাদের মর্মযাতনায় বেদনা অনুভব করছে। দেখে কিছুটা সাহস বাড়লো। তাকে জানালার কাছে ডেকে এনে বললাম, স্থানাভাবে আমাদের বড়ই দুর্গতি হচ্ছে। অন্তত অর্ধেক লোক যদি অন্য একটি ঘরে রাখতে পারো, তা'হলে ভোর হওয়া মাত্র তোমাকে এক হাজার মুদ্রা পুরস্কার দেব। জমাদার চলে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো– 'অসম্ভব!' আমি ভাবলাম, পুরস্কারের টাকার পরিমাণ হয়তো কম হয়েছে। এবার দু'হাজার মুদ্রার লোভ দেখালাম। শুনে জমাদার আবার চলে গেল। কিন্তু সেবারও ফিরে এসে গম্ভীরভাবে বললো– 'একেবারেই অসম্ভব! নবাব নিদ্রামগ্ন। তাঁর অনুমতি না নিয়ে এমন কাজে কে পা বাড়াবে? তাছাড়া এখন তাঁকে জাগাবে এমন বুকের পাটা কার আছে?'

এতক্ষণ অনেকেই শান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু যন্ত্রণা সবারই শুরু হয়েছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সারা শরীর এরূপ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলো যে, স্বচক্ষে না দেখলে ধারণা করা অসম্ভব। ঘাম তো নয়, দেহের রক্ত যেন পানি হয়েই বেরিয়ে আসছে। স্রোতধারায় গায়ের ঘাম ছুটে চলছে। সবাই পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লাম।

ন'টা না বাজতেই পিপাসা ও শ্বাসকষ্ট অসহ্য হয়ে উঠলো। বাতাস বরং সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়াই ভাল ছিল। কারণ তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সকল যাতনার অবসান ঘটতো। কিন্তু তা আর হলো না। বাতাস যেটুকু পেতে লাগলাম, তাতে না যন্ত্রণার অবসান হলো, না বাঁচার উপায় রইলো।

শেষ পর্যন্ত আর পিপাসা সহ্য করতে পারলাম না। শ্বাস-কষ্টও বেড়ে যেতে লাগলো। মিনিট দশেক পরেই বুকের মধ্যে খিল ধরে আসতে লাগলো। সে তীব্র যাতনা আর বেশীক্ষণ সহ্য করা গেল না। উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু পিপাসা, শ্বাসকষ্ট ও বুকের ব্যথা যেন বেড়েই চললো। তবে সংজ্ঞা তখনো হারাইনি। কিন্তু হায়! সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়ে শীঘ্রই কেন মরণ হচ্ছে না– কত আর কষ্ট সইবো– কতক্ষণে মৃত্যু এসে সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটাবে– এসব চিন্তায় ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়ছিলাম। একটু বাতাস, একটু বাতাস, কিছু না, কেবল একটু বিশুদ্ধ বাতাস। মনে হলো বুঝি একটু বাতাস পেলেই সব যন্ত্রণার উপশম ঘটবে।

জীবনের এমন মহা পরীক্ষায় পড়ে ধর্মের কথাও ভুলে গেলাম। সহসা কেন জানি মনে হলো, আমার কাছে একখানি ছোরা রয়েছে। সেই ছোরা বের করে নিজের শিরা-উপশিরা কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করবার উদ্যোগ করলাম ! এর মধ্যে হঠাৎ যেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ফিরে আসলো। কাপুরুষের মতো আত্মহত্যা করা নিজের কাছে বড়ই নিচ কাজ বলে মনে হতে লাগলো। তখন রাত প্রায় দু'টো। এরূপভাবে আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। আমার কাছে কেয়ারী নামে একজন নৌ-সেনানায়ক দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সারাটা দিন অতুল বিক্রমে দুর্গরক্ষা করছিলেন। তাঁকে আমার জায়গায় এসে দাঁড়াতে বলে আমি ঘরের মধ্যে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করতে কৃতসংকল্প হলাম। কেয়ারী ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু আমার স্থান দখল করার অবকাশ আর তাঁর হলো না। আমার কাঁধের ওপর একজন ওলন্দাজ বসেছিল। স্থানটি সে-ই দখল করে ফেললো। কেয়ারী তাঁর বিশাল বাহু বিস্তার করে, ভিড় ঠেলে, আমাকে ঘরের মধ্যে টেনে আনলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর সকল শক্তি ভেঙ্গে পড়লো। দেখতে না দেখতে কেয়ারীর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে আসার পরও কিছুক্ষণ সামান্য জ্ঞান ছিল। তবে যাতনাবোধ এতটুকুও ছিল না। শেষে সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেল। ভোরে কুক সাহেবের প্রস্তাবে লসিংটন এবং ওয়াল্‌কট্ মৃতদেহের ভিতর থেকে আমাকে টেনে বের করছিলেন। কিন্তু আমি তখনও সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন। এরপর ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লেগে চেতনাশক্তি ধীরে ধীরে ফিরে এসেছিল। (Printed in Holwell's India Tracts)

হলওয়েলও সংজ্ঞা ফিরে পেলেন, সিরাজদ্দৌলাও ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। সেদিনের তারিখ ছিল ২১শে জুন। সিরাজ হলওয়েলকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রহরীদের কাছে তাঁর দুর্দশার কথা শোনা মাত্র সিরাজ তাঁর কারামুক্তির নির্দেশ দিয়ে দিলেন। হলওয়েল বেঁচে গেলেন।

একথা হলওয়েল নিজেও স্বীকার করেছেন। তিনি আরো লিখে গেছেন যে, দরবারে আসার পর তাঁর দুর্দশা দেখে সিরাজদ্দৌলা তাঁর বসবার জন্য আসন দান করে পানি খেতে দিয়েছিলেন।

ইংরেজদের কোষাগারের খবর না বলায় সেনাপতি মানিকচাঁদ তাঁকে ও তাঁর তিনজন সঙ্গীকে বন্দীবেশে মুর্শিদাবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাকি সবাই মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু কথা হলো এই যে, হলওয়েল এবং তাঁর সঙ্গীদের কারারুদ্ধ করার জন্য সিরাজ মোটেই দায়ী ছিলেন না। এজন্য স্বয়ং হলওয়েলও সিরাজকে দায়ী না করে করেছেন উমিচাঁদকে। ইংরেজরা উমিচাঁদকে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করে তার ওপর যেরূপ নির্যাতন করেছিল, ধনে-বংশে ধ্বংস করেছিল– কারাবাসের আদেশ ছিল তারই প্রতিশোধ। উমিচাঁদ মানিকচাঁদকে দিয়ে সে ব্যবস্থাই করিয়ে নিয়েছিলেন। হলওয়েলও অনুরূপ কথাই লিখে গিয়েছেন :

"But that the hard treatment I met with, may truely be attributed in a great measure to Omichand's suggestion and fusinuations. I am well assured from the whole of his subsequent conduct and this further confirmed me in the three gentlemen, selected to be my companions, against each of whom he had conceived particular resentment and you know. Omichand can never forgive."(Holwell's Letter)

এতে দোষ যদিও বা কারো হয়ে থাকে তা ছিল উমিচাঁদের। কিন্তু দেশ দখলের বৈধতা প্রমাণের জন্য তা চাপানো হলো সিরাজের উপর।

## হলওয়েলের অসার কথা

হলওয়েলের পত্রখানাকে পর্যালোচনা করলে আমরা কয়েকটি বিষয় দেখতে পাই। প্রথমত, ১৪৬ জন বন্দীর মধ্যে ১২৩ জনেরই মৃত্যু হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, লিখি লিখি করেও হলওয়েল এই লোমহর্ষক অত্যাচার কাহিনী অনেক দিন পর্যন্ত লিখে উঠতে পারেন নি। অবশেষে লিখেন তিনি ঠিকই। কিন্তু তা ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিলাত যাওয়ার পথে অগাধ জলময় সমুদ্রের বুকে 'সাইরেন' নামক জাহাজে বসে। তৃতীয়ত, হলওয়েলের মতে বন্দীদেরকে নিয়ে কি করতে হবে না হবে, কোথায়, কিভাবে তাদেরকে রাখতে হবে নবাব কিছুই বলে দেন নি। সিপাহীদের প্রতিশোধ স্পৃহার জন্য তাদের এরূপ দুর্গতি ভোগ করতে হয়– এ ধরনের কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। চতুর্থত, কারাগারটি ছিল এমনই অরক্ষিত যে ইচ্ছা করলে হলওয়েল পালিয়ে যেতেও পারতেন। পঞ্চমত, কারাকক্ষ ১৮ ফুট আয়তনের একটি ক্ষুদ্র কক্ষ বিশেষ। এর মধ্যেই ১৪৬ জন লোককে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ষষ্ঠত, হলওয়েলই সবার আগে অন্ধকূপে প্রবেশ করে জানালার ধারে আশ্রয় নেন– এটা তাঁর নিজেরই কথা। কিন্তু তিনি আবার বলেছেন যে, অনেক চেষ্টা করেও জানালার ধারে আসতে তিনি ব্যর্থ হয়ে তৃতীয় সারিতে একটু স্থান পান। তা ছাড়া অন্ধকূপে বন্দীদের মধ্যে সবাই ইংরেজ ছিলেন না। তাদের মধ্যে অন্তত একজন ওলন্দাজের নাম পাওয়া যায়। সবশেষে কথা হলো এই যে, বন্দীদের দুর্গতির কথা শুনে সিরাজই সবাইকে মুক্ত করে দেন– হলওয়েলকে দরবারে আসন দান করেন। এর পর হলওয়েল ও তাঁর সঙ্গীদেরকে পুনরায় বন্দী করবার জন্য সিরাজ মোটেই দায়ী ছিলেন না।

উপরের আলোচনায় এটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, ইংরেজদের উদ্ধত ব্যবহার, বাড়াবাড়ি, বারবার নবাবের নির্দেশ অমান্য করা এবং বাণিজ্য উপলক্ষ করে এ দেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা– এসব কারণেই সিরাজদ্দৌলা কোলকাতা আক্রমণ

করতে বাধ্য হন। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও সিরাজ পরাজিত শত্রুদের সাথে দুর্ব্যবহার তো করেন নি বরং কষ্টের কথা শুনে তাদের দুর্গতি লাঘবেরই চেষ্টা করেছেন। তা সত্ত্বেও সিরাজের বিরুদ্ধে অন্ধকূপ-হত্যার কথা বলে এক জঘন্যতম মিথ্যা কাহিনী রটনা করা হয়েছে, সভ্য জগতের কাছে তাঁকে কলংকিত করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তুত এই কাহিনীর পেছনে না ছিল কোন যুক্তি, না ছিল কোন বাস্তব ভিত্তি।

১৮ ফুট একটা ঘরে ১৪৬ জন পূর্ণদেহী মানুষকে আটক রাখা একমাত্র যাদুবিদ্যা ছাড়া আর কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু নবাব অথবা তাঁর মন্ত্রী-সেনাপতিদের মধ্যে কেউ ঐ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন– এমন কথা কোথাও শোনা যায়নি। এতটুকু স্থানে এতজন মানুষের স্থান সঙ্কুলানের কথা কল্পনারও অতীত। তা ছাড়া হলওয়েলের পত্রখানা গভীরভাবে পড়লে বোঝা যায় যে, ঘরের মধ্যে লোকগুলো যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেই স্থান ছাড়া আরো খালি জায়গা ঘরে ছিল। কারণ, সবাই জানালার দিকে আসতে চায়– হলওয়েল সাহেবের এই বক্তব্য থেকে কি এটাই বোঝা যায় না যে, বন্দীদের পেছন দিকে আরো খালি জায়গা ছিল? এখন কথা হলো এই যে, ১৮ ফুটের একটিমাত্র কক্ষ, তার মধ্যে ১৪৬ জন বন্দীকে রাখার পরেও খালি জায়গা রয়ে গেছে এটা যে কোন মানুষের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হতে বাধ্য।

## সমসাময়িক ইতিহাস

নবাব সিরাজদ্দৌলার সমসাময়িক প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ছিলেন সাইয়েদ গোলাম হোসেন। তাঁর রচিত 'সিয়ার-উল-মুতাখ্খেরীন' একটি সুবিস্তৃত ও সর্বজনসমাদৃত গ্রন্থ। ১৭৮৩ সালে এর রচনা শেষ হয়। সৎ ও অসৎসহ সিরাজ-চরিত্রের প্রায় সমস্ত দিক নিয়েই গোলাম হোসেন আলোচনা করেছেন। নবাবের অনেক 'কুকীর্তি' এবং ইংরেজদের অনেক দুঃখ-দৈন্যের বর্ণনাও এই বইয়ে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু কোথাও ইশারা ইঙ্গিতে এমনকি ঘুণাক্ষরেও অন্ধকূপ-হত্যার মতো আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ঘটনার উল্লেখ পর্যন্ত তিনি করেন নি। মুতাখ্খেরীনের ইংরেজী অনুবাদক সুবিখ্যাত পণ্ডিত হাজী মুস্তফা তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের টীকায় লিখে গেছেন, "সমসাময়িক বাঙ্গালীদিগের নিকট সবিশেষ অনুসন্ধান তিনি করিয়াছেন– কিন্তু অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, খাস কোলকাতার অধিবাসীরাই অন্ধকূপ-হত্যার সংবাদ জানিতেন না।

(সিরাজদ্দৌলা, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়)

মুসলিম ঐতিহাসিকদের কথা বাদ দিলেও সমসাময়িক ইংরেজদের লিখিত কাগজপত্রেও অন্ধকূপ-হত্যার কোনই উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ হলওয়েলের সাথে অন্ধকূপ কারাগারে নির্যাতন ভোগকারী বেশ কয়েকজনই দীর্ঘকাল

বেঁচেছিলেন। আর মৃতদের আত্মীয়-স্বজন এবং স্বদেশবাসীর সংখ্যাও এদেশে কম ছিল না। এতবড় একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল তারা কেউই এর কিছু জানল না– এটা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। তা ছাড়া এসব ইংরেজ মুক্তিলাভের পর কোলকাতার সর্বত্র বাসা বেঁধেছিল, মিশেছিল স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে, দীর্ঘদিন বাস করেছিল তাদেরই কুটীরে–অথচ স্থানীয় কোন লোকের নিকট ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তারা কেউ কিছুই বলেনি, এমনটি কখনো হতে পারে না।

কোলকাতা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যেসব ইংরেজ পালিয়ে গিয়েছিলেন, পল্‌তার বন্দরে তাঁরা প্রতিদিন গোপন মন্ত্রণায় বস্‌তেন। এসব গোপন মন্ত্রণার বিস্তারিত বিবরণ বই পুস্তকেও রয়েছে। কিন্তু সেসব বইয়ের কোথাও অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

কোলকাতার ইংরেজদের পরাজয়ের খবর মাদ্রাজে গিয়ে পৌঁছানোর পর মাদ্রাজের ইংরেজগণ কোলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য বহু সলাপরামর্শ করেন এবং এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্কও হয়েছিল তাদের মধ্যে। এসব কথা হুবহু ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়ে গেছে। কিন্তু সেসব বইয়ের কোন জায়গায় অন্ধকূপ হত্যার কোন হদিস মেলে না।

মাদ্রাজের ইংরেজ দরবার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে অনুরোধ করার জন্য দাক্ষিণাত্যের নিজাম এবং আর্কটের নবাব বাহাদুরকে ধরে বসেছিল। তারপর নিজাম আর নবাব সিরাজের কাছে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতেও অন্ধকূপ হত্যার কোন কথাই ছিল না।

মাদ্রাজ দরবারের সর্বময় কর্তা পিগট্ সাহেবও অনেক তর্জন-গর্জন করে সিরাজদ্দৌলার নিকট পত্র লিখে কর্নেল ক্লাইভের মারফত সে পত্র বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেও অন্ধকূপ হত্যার কোন উল্লেখ করা হয়নি।

কোলকাতা বিজয়ের পর নবাব সিরাজদ্দৌলা তার নাম রাখেন আলিনগর। সেখানে ইংরেজদের সঙ্গে নবাব সিরাজদ্দৌলার যে সন্ধি হয় তা 'আলিনগর-সন্ধি' নামে খ্যাত। এই সন্ধিপত্রেও অন্ধকূপ হত্যার কোন উল্লেখ নেই। এ জন্যে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক দুঃখ করে লিখেছেন :

> No Satisfaction was obtained for the atrocities of the Black Hole and the absence of any provision for this purpose is the greatest scandal attached to the treaty. For this, no sufficient apology can be found. Peace was desirable, but even peace is bought too dearly when the sacrifice of national honour is the price. (Thornton's History of the British Empire—Vol. i. P. 213-215.)

কোলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য কর্নেল ক্লাইভ, ওয়াট্‌সন প্রমুখ যাঁরা একে একে বাংলায় এসেছিলেন, তাঁরা সবাই পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তীব্র ভাষায় নবাব সিরাজদ্দৌলাকে বহু পত্রই লিখেছিলেন। 'অন্ধকূপ-হত্যা' সত্য ঘটনা হলে এসব পত্রে তার অবশ্যই উল্লেখ থাকতো। কিন্তু কোথাও তা নেই।

কর্নেল ক্লাইভের প্রথম পত্রে এবং পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে লিখিত তর্জন-গর্জনপূর্ণ শেষ পত্রেও অন্ধকূপ-হত্যার নামগন্ধ দেখতে পাওয়া যায় না। ক্লাইভের প্রথম পত্রখানি ছিল নিম্নরূপ :

The Admiral Watson, Commander of the King's invincible ships and himself, a soldier whose conquest in Deccan might have reached his cars, were come to revenge the injuries he had done to the English company and it would better become time to show his love of justice, by making them ample satisfaction for all their losses, than expose his country fo be the seat of war. (Scrafton)

এবার দেখা যাক ক্লাইভের শেষ পত্রে কি ছিল ? পত্রখানি ছিল এরূপ :

That from his great reputation for justice and faithful observance his word, he had been induced to make peace with him and to pass over the loss of many crores of rupees sustained by the English in the capture of Calcutta and to rest content with whatever he, in his justice and generosity should restore to them, etc. etc. (Scrafton)

পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করা হলো। এর কারণ দর্শিয়ে ক্লাইভ কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকে যে পত্র লিখেন তাতেও তিনি অন্ধকূপ-হত্যার কোন উল্লেখ করেন নি। পত্রটিতে লেখা ছিল :

Some of Serajud-Dowla's letters to the French having fallen into my hands. I enclose a translation of them just to show you the necessity we were reduced to of attempting his overthrow. (Clive's letter to Court—August 6. 1757)

হলওয়েল ১৭৫৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী বন্ধু উইলিয়াম ডেভিসের কাছে অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণ দিয়ে একটা পত্র লিখেন। অথচ এর কায়েক বছর পর ১৭৬০ সালেল ৪ঠা আগস্ট 'সিলেক্ট কমিটি'র সমানে পলাশীর যুদ্ধ, সিরাজের সিংহাসনচ্যুতি প্রভৃতির যে বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন, তাতেও অন্ধকূপ-হত্যার স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই। এতে শুধুমাত্র এতটুকু বলা হয়েছে যে, সিরাজদ্দৌলা নির্দয়ভাবে ইংরেজদের ক্ষতিসাধন করেছিলেন। তাই ইংরেজরা গরজে পড়েই তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। হলওয়েলের ভাষায় ঃ

Necessity and a just resentment for the most cruel injuries obliged us to enter into a plan to deprive Sirajdowla of his government.

উপরে বর্ণিত এবং স্থানাভাবে আরো যা উল্লেখ করা যায়নি, এসবেই শুধুমাত্র কোম্পানীর বাণিজ্যের ক্ষতি আর দুর্গতির কথাই বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। অন্ধকূপ-হত্যার কোন কথারই উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ এসবই ছিল

সমসাময়িক কাগজপত্র বা দলিল। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অন্ধকূপ-হত্যা সম্বন্ধে আমরা যা দেখতে ও শুনতে পাই তার সবই পরবর্তীকালে রচিত ও প্রচারিত। বহুকাল পরে লেখা এসব ইতিহাস-গ্রন্থে অবশ্য অন্ধকূপ হত্যার কথা স্পষ্টাক্ষরেই লেখা হয়েছে। যেমন ঃ

> The barbarities practised on the English and the horrible death of 123 of them in the Black Hole, called for Vengeance. (The Great battles of the British Army—p. 162.)

নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের পর বাঙলার মসনদে বসেন ক্লাইভের অনুগত মীর জাফর। তার সঙ্গে ইংরেজদের একটি সন্ধি হয়। সন্ধির শর্ত মুতাবিক এদেশে ইংরেজদের যত কিছু ক্ষতি হয়েছে, তারা মীর জাফরের কাছ থেকে সে সবের প্রত্যেকটির ক্ষতিপূরণ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে। এ সবের বিস্তারিত বিবরণ উক্ত সন্ধিপত্রে পুংখানুপুংখরূপে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার কোন উল্লেখ তাতেও নেই। অন্ধকূপ কারাগারে এত বিরাট হত্যাকাণ্ড ঘটলো, এত নির্যাতন চললো, এতগুলো ইংরেজ মরলো, ইংরেজদের এত বিরাট ক্ষতি হলো, মৃতদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন তখনো জীবিত রইলো॥ অথচ সন্ধিশর্তে সেসবের কোন উল্লেখ হ'লো না, মৃতদের স্ত্রী-পুত্রের জন্য এক পয়সাও ক্ষতিপূরণ আদায় কেউ করলো না, এটা কি করেই বা সম্ভব হতে পারে তা বুঝে উঠা মুশকিল। সুতরাং অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনী যে সম্পূর্ণ মনগড়া একটা অলীক কাহিনী মাত্র, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

## ব্ল্যাকহোল মনুমেন্ট

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম এদেশে বাণিজ্য করতেই এসেছিল। সে সময় এ উপমহাদেশে যেসব ইংরেজ এসেছিল তাদের সবাই ছিল কোম্পানীর কর্মচারী। কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়েই তথাকথিত অন্ধকূপ কারাগারে তারা (ইংরেজদের কথা অনুযায়ী ধরা যাক) ঘোর নির্যাতন ভোগ করেছিল, এমনকি নিজেদের মূল্যবান জীবন বিসর্জন দিয়ে কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষা, সিরাজের পতন এবং এদেশে ইংরেজের বিজয়ের পথ সুগম করে তুলেছিল। এরপর শতাধিক বছর এদেশে কোম্পানীরই শাসন চলে। কিন্তু এই দীর্ঘ এক শতাব্দীকালের মধ্যে কোম্পানীর স্বার্থের জন্য সেদিন যারা জীবন বিসর্জন দিয়েছিল অন্ধকূপ কারাগারে (ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে একমাত্র অন্ধকূপ হত্যাই এদেশে বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মূল কারণ। —(The great battles of the British Army, দ্রষ্টব্য); তাদের স্মৃতি রক্ষার্থ কোম্পানী উদ্যোগী হয়ে সরকারীভাবে কোন স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেনি কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী ইংরেজ ইতিহাস লেখকরা যারা সিরাজ এবং এদেশীয়দের নিন্দা অপরাধে সোচ্চার-সাবধানের সাথেই চেপে

গেছেন। অথচ আমরা দেখতে পাই সিপাহী-মহাবিদ্রোহকালে কানপুর, মনিপুর প্রভৃতি স্থানে হানাহানির মধ্যে দু'দশজনের হত্যাকাণ্ড সহ ছোটখাটো ঘটনাগুলোকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কত বিপুল প্রচেষ্টাই না করা হয়েছে, আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে এ উপমহাদেশের এখানে-ওখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহু স্মৃতিস্তম্ভ। অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনী যদি মস্তিষ্কপ্রসূত ব্যাপার না হয়ে বাস্তব কোন ঘটনা হতো তাহলে আমরা ভিন্নরূপ অবস্থা দেখতাম না কি? কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমরা যা দেখি, তা হলো এই যে, স্বজাতি বীরপুরুষদের স্মৃতিরক্ষার জন্য কোম্পানী নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে কোনকিছুই করেনি। হলওয়েল সাহেবই শুধু নিজ কীর্তি জাহির করার মানসে নিজ খরচে 'ব্ল্যাকহোল মনুমেন্ট' নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি ১৭৬০ সালে এই মনুমেন্টটি কোলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস-এর একেবারে পশ্চিম দিকে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। হলওয়েল তাঁর নিজস্ব গ্রন্থে মনুমেন্টটির একটি চিত্রপটও রেখে গেছেন। তাতে দেখা যায় যে, এই স্মৃতিস্তম্ভের প্রস্তরফলকে লেখা ছিল :

**To**

**THE MEMORY**

**OF**

Edw, Eyre, Wm, Baillie, Esqrs, The Revd, Fervas Bellamy, Messrs, Jenks, Pevely, Law, Coales, Nalicourt, Jebb, Torriano, E. page, S. page Grub, Street, Harod, P. Johnstone, Bellard, N. Drake, Carse Krapton, Gosling, Don, Dalrymple, Captains Clayton, Buchanan, Wilherington, Lieutnants Bishop, Hays, Blagg Supson, J. Bellamy, Eusings, Peaecard, Scott, Hastings, C. Wedderburu, Dumbleton, Sea-captains Hunt, Osburu, Purnell, Messrs, Carey, Leech, Stevension, Gay, Porter, Parver, Caulker, Bendall Atkinson, who with Sundray other inhabitants, Military and Militia to the number of 123 persons were by the Tyranic violence of Seraj-Ud Dowla, Suba of Bengal suffocated in the Black Hole prison of Fort William in the Night of the 20th day of June 1756 and promiseuously thrown the succeeding morning into the Ditch of the Ravelin of this place.

This

Monument is erected

by

Their surviving fellow sufferer

J. Z. HOLWEll.

এ ছাড়া অপর একখানি ফলকে লেখা ছিল :

This Horrid Act of Violence
was an amply
as deservedly revenged
On Siraju' D-Dowla.
by his Majesty's Arms,
Under the conduct of
Vice Admiral Watson and Colonel Clive.
Anno, 1757.

এদেশে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূল কারণ নাকি অন্ধকূপ-হত্যা। এই হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিবিজড়িত ইংরেজদের সেই পবিত্র মনুমেন্টের অস্তিত্ব এখন আর নেই। মার্কুইস অব হেস্টিংস বাঙলার গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার পর সামান্য একটি কাস্টমস ঘর নির্মাণের জন্য ১৮২১ সালে তিনি এটি ভেংগে ফেলে দেন। কারণ কাস্টমস ঘরে নাকি স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। এরপর লর্ড কার্জন যখন ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন, তখন তিনি আবার এই মনুমেন্ট স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কিত অনেক কাগজপত্র, নক্‌শা-ছবি ঘেটেঘুঁটে তিনি হলওয়েলের মনুমেন্টের হদিস পান। অবশেষে ১৯০২ সালে লর্ড কার্জনই আগাগোড়া মার্বেল পাথর দিয়ে পূর্বেকার স্মৃতিস্তম্ভের অনুরূপ একটি মনুমেন্ট গড়িয়ে নেন এবং ক্লাইভ স্ট্রীট আর ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড়ে হলওয়েলের পুরনো মনুমেন্টটির জায়গায়ই নতুন স্মৃতিস্তম্ভের পত্তন করেন। এ দেশের হিন্দু মুসলিম জনতার নিকট তা অসহনীয় ছিল। সুতরাং ১৯৩৯ সালে বাংলার সকল মানুষের মিলিত চেষ্টায় দেশের কলংক এই মনুমেন্ট আদি স্থান থেকে সরিয়ে সেন্ট জোন্সের খ্রীস্টান গোরস্থানে ফেলে দেয়া হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নিজেদের সৃষ্ট কীর্তিকাহিনী, হেফাজত করা ইংরেজদের এক জাতিগত বৈশিষ্ট্য। অন্ধকূপ হত্যার ঘটনা সত্য হলে তাঁরা প্রথম থেকেই এই ব্লাকহোল মনুমেন্টেরও হেফাজত করতেন। অথচ তা না করে সামান্য কাস্টমস হাউস-এর স্থান সংকুলানের অজুহাতে তাঁরা এরূপ একটি জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ ধূলিসাৎ করে দিলেন– আর রক্ষণশীল ইংরেজ জাতির কেউই এর একটু প্রতিবাদও জানালেন না এ হতেই পারে না। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেছেন, “কোলকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে সেকালের ইংরেজদিগের যে সকল জরাজীর্ণ সমাধি ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তা আজিও কত যত্নে, কত ব্যয়ে, কত সমাদরে রক্ষিত হচ্ছে। আর এমন পবিত্র সমাধিস্তম্ভ বিলুপ্ত হইল, অথচ কেউ কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না। (সিরাজদ্দৌলা, টীকা-পৃ. ২০৯)

এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যালোচনায় দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী একটি কল্পিত, রচিত, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন রটনা ছাড়া আর কিছু নয়। আসল কথা এই যে, ইংরেজ এদেশে আসে বাণিজ্য মানসে, কিন্তু বণিকের ভেক ধরে এখানে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে তারা এদেশের রাজনীতিতে ঢুকে পড়ে, কুটিলতা আর শঠতার জাল বিস্তার করে, দুর্নীতি আর ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেয় এবং অন্যায়ভাবে সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করে। ইংরেজ বণিকের এই কুকীর্তির কথা শুনে ইংলন্ডের ভদ্র নরনারীরা তুমুল কোলাহল শুরু করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লোকদের এই সব অপকর্মের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রচণ্ড উত্তেজনার ঝড় বয়ে যায়। নিজেদের কুকীর্তিকে ধামাচাপা দেয়া, আন্তর্জাতিক নীতিবিরোধী নিজেদের এই অপকর্মের বৈধতা প্রমাণ করা এবং স্বদেশবাসীকে শান্ত করার উদ্দেশ্যেই বেনিয়া-বুদ্ধি নিয়ে ইংরেজ এই অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীর ন্যায় একটি জঘন্যতম মিথ্যার জাল রচনা করে। আরো উদ্দেশ্য ছিল সিরাজদ্দৌলাকে শুধু স্বদেশবাসীর নিকটই নয় বরং সারা বিশ্ববাসীর কাছেই নরপিশাচ রূপে চিত্রিত করা ও সভ্য জগতের নিকট সিরাজ-চরিত্র কলংকিত করে তুলে ধরা। অথচ এটা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন রচনা কাহিনী, তা শুধু মুসলমান নয়, হিন্দু, ইংরেজ ও অন্যান্য ধর্মের ঐতিহাসিকদের মতেও তা মিথ্যা, ভিত্তিহীন, অলীক এবং প্রমাণেরও অযোগ্য কাহিনী। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থের রচয়িতা বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁর গ্রন্থের টীকায় লিখেছেন, "অন্ধকূপ-হত্যা সম্বন্ধে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ তারিখে কোলকাতা হিস্টরিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটির গৃহে একটি বিচার সভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভায় মাননীয় এফ. জে. মোনাহান, শ্রীযুক্ত লিটল্ এবং বর্তমান গ্রন্থকার (মৈত্রেয় মশায়) অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া কেন স্বীকার করা যায় না, তাহা প্রমাণ প্রয়োগে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।" (সিরাজদ্দৌলা, পৃ. ২০০)

এছাড়া প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক জে. এইচ. লিটল্ অন্ধকূপ-হত্যার ঐতিহাসিক প্রমাণাদির সমালোচনা করে কোলকাতা 'হিস্টরিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় হলওয়েল রচিত ও প্রচারিত এই কাহিনীকে 'gigantic hoax' বলে বর্ণনা করেছেন। (Bengal : Past & Present— Vol, xi. Serial No. 12. pp. 75-104

## যুক্তির কষ্টিপাথরে

১৮২১ সালে বাংলার গভর্নর জেনারেল মার্কুইস অব হেস্টিংস 'কাস্টমস ঘরের' স্থান সঙ্কুলানের জন্য হলওয়েল স্থাপিত 'ব্ল্যাকহোল মনুমেন্ট ধূলিসাৎ করে দেন। এর কয়েক

বছর আগে ১৮১৮ সালে তথাকথিত অন্ধকূপ কারাগারটি একেবারে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল (Early Records of British India দ্রষ্টব্য)। অথচ এ সময় এ দেশে ইংরেজদেরই শাসন ছিল। এই শাসন প্রতিষ্ঠার মূলে যারা তাদের স্মৃতির হেফাজত না করে তার প্রতীক ইংরেজরাই সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলবেন– তা কখনই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতে পারে না। আর যদি আসল রহস্য ফাঁক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এই কারাগারের অস্তিত্ব ধ্বংস করা হয়ে থাকে তবে পুনরায় এর কথা বলাকে অবান্তরই ধরতে হবে। ইংরেজরা দাবী করে যে, ১৮৮৩ সালে মাটি খোঁড়ার সময় ২২ ফুট দীর্ঘ এবং সাড়ে ১৪ ফুট প্রস্থ অন্ধকূপ কারাগারের হদিস নাকি তারা পেয়ে যায়। বস্তুত এটা এক পরস্পরবিরোধী দাবী। কারণ ১৮১৮ সালে অন্ধকূপ কারাগার ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং ১৮২১ সালে ব্ল্যাকহোল মনুমেন্টটি ধূলিসাৎ করা হয়– দীর্ঘ ৬২ বছর পর ১৮৮৩ সালে আবার সেই কীর্তিস্থল আবিষ্কার করাকে উদ্দেশ্যমূলক আবিষ্কার বলেই মনে হয়।

তাছাড়া অন্ধকূপ কারাগারের আয়তন সম্পর্কেও ইংরেজদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মত দেখা যায়। লর্ড মেকলের মতে এর আয়তন ২০×২০ ফুট, খোদ হলওয়েলই বলেছেন অন্ধকূপ কারাগারের আয়তন ১৮×১৮ ফুট, আবার অধ্যাপক উইলসন দাবী করেন যে, কারাগারটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট এবং প্রস্থে ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি ছিল। অথচ ১৮৮৩ সালে খননের সময় যে অন্ধকূপ কারাগারের স্থান আবিষ্কৃত হয় তার আয়তন নাকি ছিল দৈর্ঘ্যে ২২ ফুট এবং প্রস্থে সাড়ে ১৪ ফুট।

হলওয়েল অন্ধকূপ কারাগারের ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্বয়ং নির্যাতন ভোগকারী। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁর কথাই আমাদের মেনে নিতে হবে। যদি তাই সত্য বলে ধরে নেয়া যায়, তবে ১৮ × ১৮ ফুট আয়তন বিশিষ্ট এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ১৪৬ জন পূর্ণদেহী ইংরেজকে বন্দী করে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই জন্যেই হলওয়েলের বিবরণে বিস্ময় প্রকাশ করে ড: ভোলানাথ চন্দ্র বলেছেন :

> As to the Black Hole tragedy, the unburied site which is the subject of so much fuss in our day,— I have a very doubtful faith in its account. Holwell, one of the fellow sufferers was the first to publish it to the world. But I have always questioned it to myself, how could 146 beings be squezed into a room 18 feet square even if it were possible to closely pack them like the seeds within a pomegranate or like the bags in a ship's hold made into one mass by packets, shoved in here and there into the interestices? Geometry contradicting Arithmetic gives a lie to the story. It is little better than a bogey against which was raised an uproar of pity. (Calcutta University Magazine)

দ্বিতীয়ত, সিরাজদ্দৌলা যখন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ জয় করেন, তখন দুর্গে সর্বসাকুল্যে ১৪৬ জন লোক ছিল কিনা তাতেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

কেননা, সিরাজদ্দৌলার কোলকাতা আক্রমণের খবর পেয়ে কোলকাতার অধিবাসী ইংরেজদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয় ও চারিদিকে মহা হুলস্থুল পড়ে যায়। আতংকিত ইংরেজ নরনারী দলে দলে সরে পড়তে থাকে। হলওয়েলের স্বরচিত গ্রন্থ 'India Tracts'-এ দেখা যায় যে, সিরাজের কোলকাতা আক্রমণের কয়েকদিন পূর্বে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণকারী ইংরেজদের যে সংখ্যা গোনা হয়েছিল, তাতে দুর্গে সব মিলিয়ে ১৯০ জন যোদ্ধা ছিলেন। আর এদের মধ্যে মাত্র ৬০ জন ছিলেন ইউরোপীয়। হলওয়েলের ভাষায় :

> The troops in garrison consisted by the musterrolls laid before us about the 6th or 8th of June, of 145 in battalion and 45 of the trained officers included in both only 60 Europeans.

নবাব সিরাজের ভয়ে আতংকগ্রস্ত এই মুষ্টিমেয় ইংরেজের পক্ষে দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব দেখে উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাগণ তহবিলপত্র নিয়ে পালিয়ে যাওয়াই সাব্যস্ত করেন (Orme. Vol-ll. 69)। এ থেকেই ইংরেজ সেনানায়কদের সে সময়ের মনের অবস্থা অধিকভাবে বুঝা যাবে। বস্তুত ইংরেজ বীরপুরুষদের মধ্যে কে কার আগে ভাগবেন, এ নিয়ে রীতিমত হুলস্থুল শুরু হয়ে গিয়েছিল। দুর্গাধিপতি ড্রেক সাহেব পালিয়ে গেলেন। সেনাপতি মিনচিন, ক্যাপ্টেন গ্রান্ড মিঃ ম্যাকেট ম্যানিংহাম, ফ্রাঙ্কল্যান্ড, রেভারেন্ড, ক্যাপ্টেন লেঃ মেপল্‌টফট্, ক্যাপ্টেন হেনরী ওয়েডারবর্ন, সমনার, চার্লস ডগলাস প্রভৃতি সেনানায়কও ড্রেক সাহেবকে অনুসরণ করেছিলেন।

এদের পালিয়ে যাওয়ার পর হলওয়েলের হিসেব অনুসারে দুর্গ জয়ের সময় দুর্গে ৫০ জনের বেশী ইউরোপীয় থাকতে পারেন না। তা ছাড়া ওসব সেনানায়কের পলায়নের পর দুর্গের লোকজন সবাই মিলে হলওয়েলকে সেনাপতি মনোনীত করে। হলওয়েল যেদিন দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করেন, সেদিন দুর্গে শুধুমাত্র ১৭০ জন লোক বর্তমান ছিল (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও হলওয়েল)। দু'দিনের অক্লান্ত যুদ্ধে অনেকেই প্রাণ হারায়। আর যাদের শক্তি ছিল, সাহস ছিল, পালিয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি ছিল, তারা অনেকেই এই অবসরে পালিয়ে যায়। কারণ পালিয়ে যাওয়ার যে সুযোগ ছিল, স্বয়ং হলওয়েলও তা স্বীকার করেছেন।

অন্ধকূপ-হত্যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বন্ধু ডেভিসের কাছে তিনি যে পত্র লিখেছেন, তাতে তিনি মি: লিচ্ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে ফেলেছেন :

"মুসলমানরা যে সময় তুমুল কোলাহল করে দুর্গে প্রবেশ করেছিল, লিচ্ সেই সুযোগে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আঁধারের মধ্যে ফিরে এসে তিনি আমায় চুপি চুপি বলতে

লাগলেন যে, তিনি নদীতীরে নৌকা প্রস্তুত করে রেখে এসেছেন। আমি পালিয়ে যেতে রাজী কি-না, শুধুমাত্র তা জানার জন্যই তিনি গোপন পথে দুর্গে প্রবেশ করেছেন।। এ সময় আমাদের কাছে পাহারাদার বেশী ছিল না। যারা ছিল, তারাও নিঃসন্দেহ মনে দূরে দূরে পায়চারী করেছিল। ইচ্ছা থাকলে অনায়াসেই পালিয়ে যেতে পারতাম।" (India Tracts)

প্রাণভয়ে ড্রেক সাহেবদের ন্যায় বীরপুরুষগণ যেখানে ভেগে পড়েছেন, সেখানে এই নিদারুণ নির্যাতন থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েও যে অবরুদ্ধ ইংরেজদের কেউ পালান নি, এমন কথা বলা যায় না। সুতরাং এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবাবের সৈন্যদের নিকট কেবল তারাই আত্মসমর্পণ করেছিল, যারা আহত, মুমূর্ষু এবং পলায়নে অক্ষম ছিল কিংবা পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। তা ছাড়া হলওয়েল তাঁর 'India Tracts' গ্রন্থে যেসব মৃত ও মুমূর্ষু লোকের নাম উল্লেখ করেছেন, তাতে মাত্র ৬৬ জনের নামই পাওয়া যায়।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সাইয়েদ গোলাম হোসেন তাঁর সিয়ার উল মুতাখ্খেরীনে বলেছেন যে, যে সকল নরনারী মির্জা আমীর বেগের হাতে ধরা পড়ে, মীর জাফরের দয়ায় ও সহায়তায় তারা সেদিনই নিরাপদে পল্তায় প্রেরিত হয়। এমতাবস্থায় অন্ধকূপ কারাগারে ১৪৬ জনকে বন্দী রাখার ব্যাপারেও অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

হলওয়েল অন্ধকূপে মৃতের যে সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, তাও সঠিক নয়। কেননা, তাঁর মতে অন্ধকূপ কারাগারে অবরুদ্ধ ১৪৬ জনের মধ্যে '১২৩ জন ইউরোপীয় মারা যায়।

অথচ তাঁর হিসাব মতেই আমরা দেখতে পাই যে, দুর্গজয়ের সময় দুর্গমধ্যে ৫০ জনের অধিক ইউরোপীয় ছিল না। এই ৫০ জনের মধ্যে ১২৩ জনকে মেরে ফেলাটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। অতএব ১৮×১৮ ফুট আয়তনের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ১৪৬ জন লোকের কারারুদ্ধ হওয়ার যে উক্তি হলওয়েল করে গেছেন, তা যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা, অবাস্তব ও অসম্ভব, ঠিক তেমনি ১২৩ জন ইউরোপীয়কে হত্যা করার কথাও একেবারে উদ্ভট কাহিনী বলেই ধরে নিতে হবে। পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, এরূপ একটি অবাস্তব ও জঘন্যতম মিথ্যা কাহিনীকে ইংরেজ ঐতিহসিক মাত্রেই একবাক্যে সত্য বলে জাহির করে বিশ্বব্যাপী সিরাজের কলংক রটিয়েছেন, সিরাজ-চরিত্রকে কলুষিত করতে চেয়েছেন। অথচ অন্ধকূপ হত্যার জন্য প্রকৃতপক্ষে কে দায়ী, সে বিষয়েও তাঁরা একমত হতে পারেন নি।

এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের পর প্রায় দুই শতাব্দীকাল ধরে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এ দশবাসীর ওপর কি নির্যাতন চালিয়েছে, কত অমানুষিক ও বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, এদেশবাসী তা ভুলে যায়নি। ভুলে যায়নি সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের

কথা, শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ, তাঁর সন্তান ও পরিজনদের সাথে কৃত অপরাধের ইতিহাস। অমৃতসরের হত্যাকাণ্ড, জালিয়ানওয়ালবাগে নিরস্ত্র জনগণের ওপর বর্বর ডায়ারের মেশিনগানের গুলীবর্ষণ, বাংলায় নিরীহ কৃষকদের ওপর ইংরেজ নীল কুঠিয়ালদের নির্যাতন এবং আরো অসংখ্য ঘটনার করুণ স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি। অমৃতসরের হত্যাকাণ্ড হলওয়েল রচিত মিথ্যা অন্ধকূপ হত্যাকেও ম্লান করে দিয়েছে। ১৮৫৭ সালের ১লা আগস্ট ইংরেজরা অমৃতসরে একটি ছোট ঘরে বহুসংখ্যক ভারতীয় সিপাহীকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। পরে একদিন কারাকক্ষের ভেতর থেকে এক-একজনকে বাইরে টেনে এনে ২৩৭ জন নিরীহ সিপাহীকে গুলী করে মেরে ফেলা হয়। এই হত্যালীলা দেখে বন্দীদের মধ্যে আর কেউ বাইরে আসতে চাইছিল না। এই অবস্থায় ইংরেজ কর্তাদের আদেশে কক্ষদ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়। পরে দরজা খুলে যে ৪৫ জনকে বাইরে টেনে আনা হয়েছিল তাদের কারও দেহে তখন প্রাণ ছিল না। আতঙ্কে, রণশ্রমে এবং অত্যধিক গরমের ফলে সর্দি-গর্মিতে ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অশেষ কষ্টের মধ্যে তাদেরও যে মরতে হয়েছিল সে কথাটা শ্বেতাঙ্গদেরও স্বীকার করতে হয়েছে।

> The doors were opened and behold, they were all dead. Unconsciously the tragedy of Holwell's Black-Hole had been re-enacted. Forty five bodies — dead from fright, exhaustion, fatigue, heal and partial suffocation — were drugged into light.
> (The Crisis in the Punjab—p. 162)

এ জন্যেই মিঃ বেভারিজ নামে জনৈক প্রখ্যাত ইংরেজ বিচারপতি বলেছেন :

অন্ধকূপ-হত্যার কথা তুলে নবাব সিরাজদ্দৌলার নিষ্ঠুর স্বভাবের কলংক ঘোষণা করা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না। এ বিষয়ে বোধ হয় মতবিরোধের নিষ্পত্তির চেষ্টা না করাই কর্তব্য। ১৮৫৭ সালের ১লা আগস্ট অমৃতসরে কি দুর্ঘটনাই না সংঘটিত হয়েছিল। (Calcutta Review— April, 1892)

এ হলো আধুনিক সভ্যতার দাবীদার তথাকথিত সুসভ্য ইংরেজদের জঘন্যতম বর্বরতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। অথচ এজন্যে লজ্জায় ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের মাথা নত হয় না। এটাকে বর্বরতা বলতেও তাঁরা রাজী নন। ইংরেজ পরদেশ দখলে রাখার জন্য অধিকৃত দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের ওপর যেরূপ বর্বরতা দেখিয়েছে, সিরাজদ্দৌলা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা, দেশবাসীর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেও যুদ্ধবন্দীদের সাথে এর শত ভাগের এক ভাগও অন্যায় করেন নি। উপরন্তু যেখানে ইংরেজ বিরোধীদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, সেখানে সিরাজ পরম শত্রু, পরদেশলোভী, ষড়যন্ত্রকারী উদ্ধত ইংরেজ যুদ্ধবন্দীদেরকে সসম্মানে মুক্ত করে দিয়েছেন।

তবুও সিরাজ চরিত্র কলংকিত হয়েছে বোধ হয় 'সুসভ্য' ইংরেজ জাতির মাহাত্ম্য প্রচারের সুবিধার্থেই। আমরা দেখতে পাই কল্পিত অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনীর রচয়িতা ও প্রচারক স্বয়ং হলওয়েলও এজন্য নবাবকে দায়ী করেন নি। তাঁর মতেও অন্ধকূপ-হত্যার ব্যাপারে সিরাজের বিন্দুমাত্র হাত ছিল না। নবাব-সেনারা ইংরেজদের পূর্বকৃত নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই এরূপ দুর্ঘটনা সৃষ্টি করেছে বলে তাঁর বিশ্বাস। কোলকাতা দুর্গ দখলের অব্যবহিত পরে সেখানে যা ঘটেছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই- নবাব সিরাজদ্দৌলা দরবারে সর্বজনসমক্ষে হলওয়েলের বন্ধন মোচন করে দিয়েছেন, বন্দীদের সাথে বীরের ন্যায় ব্যবহার করেছেন, হলওয়েল এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে মুক্তি দিয়েছেন, তাঁদেরকে অভয় দান করেছেন। বন্দীদের উৎপীড়ন করাই যদি সিরাজদ্দৌলার অভিপ্রায় হতো, তাঁকে কখনোই তাদের সাথে এরূপ ভদ্র ব্যবহার করতে দেখা যেত না। তা ছাড়া প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে নবাব সেনারা এ দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে বলে হলওয়েল সাহেব যে দাবী করেছেন তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেননা, যদি তা সত্যি হতো তাহলে নবাব সেনারা ইংরেজদেরকে দুর্গে প্রবেশের সময়ই হত্যা করতে পারতো। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক স্টুয়ার্টও একথা স্বীকার করে বলেছেন :

> The English having surrendered their arms, the Nawab's troops refrained bloodshed.

দ্বিতীয়ত, হলওয়েল ও তাঁর সঙ্গীরা সারাদিন নবাবের বিরুদ্ধে লড়েছে, নবাব-সেনাদের গতি রোধ করেছে। ফলে বহু নবাব-সৈন্য হতাহতও হয়েছে। কিন্তু তবুও তারা যে পরাজিত ও বন্দী ইংরেজদেরকে সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে স্বচ্ছন্দে সান্ধ্য হাওয়া উপভোগের সুযোগ দিয়েছে, একথা স্বয়ং হলওয়েলই স্বীকার না করে পারেন নি। ইংরেজ-বন্দীরা কিন্তু নবাবের দেওয়া সুযোগের অপব্যবহার করে সিপাহীদের উপর হামলা করে এবং পালিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। এর ফলেই প্রহরীরা তাদেরকে অবরোধ করতে বাধ্য হয়। এটা আন্তর্জাতিক নীতি ও দেশীয় আইনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বৈধ ছিল। ইংরেজরাও এক্ষেত্রে অনুরূপ কাজ করতে দ্বিধা করতো না। সুতরাং এই যুদ্ধবন্দীদের আটকের জন্য নবাব সৈন্যদেরকেও দায়ী করা যায় না। এছাড়া যুদ্ধবন্দীদের আটকের হুকুম হবার পর সেখানে অবস্থানরত ইংরেজরাই কারাকক্ষের পথ দেখিয়েছিল। নবাব-সেনাদের এর আয়তন সম্পর্কে কিছুমাত্র জানা ছিল না। (Mill Vol. iii.)

আর ইংরেজদের মধ্যে অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনীর রচয়িতা হলওয়েলই সর্বপ্রথম এ পথ দেখান। তিনি এতে ঢুকতে কোন আপত্তি না করে সরাসরি কারাকক্ষে প্রবেশ করেন এবং অন্যরাও তাঁকে অনুসরণ করে। শেষে প্রহীরা তাঁদেরকে সেখানে কারারুদ্ধ করে রাখে। এতে তাদের কষ্ট হয়ে থাকলে তা বুঝিয়ে বলা কিংবা নবাবের কোন

সেনাপতিকে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করাই তাদের পক্ষে সঙ্গত হতো। কিন্তু তারা তা না করে শুরু করলো আস্ফালন আর হয়ে উঠলো উদ্ধত, চেষ্টা করতে লাগলো গায়ের জোরে দরজা ভেঙ্গে ফেলার। এভাবে উৎপাত সৃষ্টি করে তারা প্রহরীদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলায় বাধ্য হয়েই প্রহরীরা দরজা বন্ধ করে দেয়। এরপর বন্দীদের পালিয়ে যাওয়ার ভয়ে নবাবের অনুমতি ছাড়া তারা আর দরজা খুলতে সাহস পায়নি। এজন্য প্রহরীদেরকে কিছুতেই অপরাধী করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, যারা কারাকক্ষে জানালার পাশে ছিল তারা বিশেষ যাতনা ভোগ করেনি। অন্ধকার কারাকক্ষের অপরাংশে লোকচক্ষুর অন্তরালে, হলওয়েলের লেখা অনুযায়ী, যারা যাতনা ভোগ করছিল, প্রহরীরা তাদেরকে দেখতে পায়নি। এজন্যও নিশ্চয়ই প্রহরীরা দায়ী নয়। এসব কথার যথাযথ আলোচনা-পর্যালোচনা ছাড়াই ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ লিখে গেছেন যে, সিরাজদ্দৌলা নিজেই এজন্য দায়ী। কারণ, তিনিই তাদেরকে অন্ধকূপ-কারাকক্ষে অবরোধের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক Thornton তো স্পষ্ট মন্তব্যই করেছেন :

> But the probability is, that the Subahdar had himself made or sanctioned the selection of the Black-Hole as the place of confinement, for when the miserable prisoners besought that they might be relieved by the removal of part of their number to some other place, their prayer was unavailing. because it could not be granted without the express orders of the Subahdar, whose sleep no one dared to disturb for so trivial a purpose as the preservation from death of nearly one hundred and fifty human beings. [History of the British Empire—Vol. i. 197]

অর্থাৎ প্রমাণ থাক আর না থাক, কার্যকারণ বিচার করে, সুবাদারকেই (সিরাজদ্দৌলা) এজন্য অপরাধী করতে হয়। তা না হলে তাঁর নির্দেশ ছাড়া দরজা খুলতে কারো সাহস কেন হলো না? ইংরেজদের হিসেব মতো প্রায় দেড়শো লোকের জীবনের অবসান ঘটলো। অথচ এতগুলো নরনারীর জীবন রক্ষার জন্য সামান্যতম সময়ের তরে তাঁর সুনিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে ইতস্তত হলো কেন? এটাই তো সিরাজের অপরাধী হওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ। এসব কথা দিয়েই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, সিরাজদ্দৌলার নির্দেশেই এরূপ নির্যাতন সংঘটিত হয়েছিল।

কিছুক্ষণের জন্য যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, অন্ধকূপ-হত্যা একটি সত্য ঘটনা, তবে বিনা দ্বিধায় বলতে পারি– এজন্য প্রথম স্বয়ং ইংরেজরাই অপরাধী। কেননা, অন্ধকূপ জিনিসটার প্রবর্তন ইংরেজরাই প্রথমে করেছিল। হাওয়ার্ডের পূর্বে তাঁদের দেশেই এরূপ পূতিগন্ধময় ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্ধকূপের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়।

এই মানসিকতা নিয়েই ইংরেজ এদেশে আসে। এখানে এসেও তারা স্বদেশের সেই ঘৃণ্য ব্যবস্থার অনুসরণের দ্বারা এদেশেও অন্ধকূপের সৃষ্টি করে। এই অন্ধকূপেই তারা অপরাধীদের শাস্তি দিত, তাদের ওপর নির্যাতন চালাতো। কত বিদ্রোহী সৈনিক ও নাবিক, বাংলার কত অন্নবস্ত্রহীন দাদনগ্রস্ত গরীব জনসাধারণ এই অন্ধকূপে চরম নির্যাতন ভোগ করে ছটফট করতে করতে মরতো তার ইয়ত্তা নেই। বিশিষ্ট ইংরেজ ঐতিহাসিক জেম্‌স্ মিল তাই দুঃখ করে লিখেছেন :

> What had they to do with a Black-Hole? Had no Black-Hole existed (as none ought to exist anywhere, least of all in the sultry and unwholesome climate of Bengal) those who perished in the Black-Hole of Calcutta would have experienced a different fate.
> (History of British India—Vol. ii. 149 noli.)

মিল দুঃখ করেছেন, হায়! যদি অন্ধকূপ না থাকতো, তাহলে তো আর ইংরেজ-বন্দীদের এরূপ দুর্গতি ও শোচনীয় পরিণাম হতে পারতো না। তাই বলতে হয়, নিজেদের রচিত অন্ধকূপেই ইংরেজরা এই যাতনা ভোগ করেছেন। তা না হলে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কলকাতায় সিরাজদ্দৌলা অন্ধকূপ রচনা করতেন না আর ইংরেজদেরকেও তাতে এই যাতনা দিতেন না। কাজেই অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনী সত্য হলেও সে অপরাধের জন্য মূল আসামী ইংরেজদেরকেই হতে হবে– বাংলার নবাবকে নয়।

## মিথ্যার বেসাতি

অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনীর রচয়িতা এবং প্রথম প্রচারক ছিলেন হলওয়েল। ওপরের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে, হলওয়েলের এই রচিত কাহিনী যুক্তির ধোপে টেকে না। কিন্তু তবুও ইংরেজ ঐতিহাসিকদের অনেকেই বিনা দ্বিধায় তা স্বীকার করে গেছেন– বিশ্বাস করেছেন স্বদেশী ভাইয়ের এই অবাস্তব কল্পকাহিনীকে, দরদ দেখিয়েছেন স্বদেশী শ্বেতাঙ্গদের প্রতি তথাকথিত নির্যাতনে শিউরে উঠেছেন কালা-আদমীর দেশের নবাব সিরাজের নৃশংসতায়। কিন্তু এসব কাহিনীর উদ্‌গাতা যে লোকটি সে যে কতটুকু সত্যবাদী, কতখানি বিশ্বাসযোগ্য, তার পরিচয় পাই আমরা তার পরবর্তী জীবনে। সেই তথাকথিত 'অমর' স্রষ্টা হলওয়েল সাহেবের ঐ সময়ের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই নিজের স্বার্থে মিথ্যার বেসাতিই ছিল হলওয়েলের একমাত্র পেশা। এ জন্য অন্ধকূপ-হত্যার ন্যায় আরো কত কাহিনী যে, হলওয়েল রচনা করেছেন, তার শেষ নাই।

মীরজাফর ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বন্ধু ছিলেন ক্লাইভ, ওয়াট্‌স্, হলওয়েল সবারই। জীবনে তাদের বহু উপকার করেছেন তিনি। এমনকি শেষ পর্যন্ত

ইংরেজ-মীরজাফরের যুক্ত ষড়যন্ত্রেই সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন, নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন। এরই পুরস্কারস্বরূপ ইংরেজরা মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসিয়েছে। বিনিময়ে মীরজাফর ইংরেজদেরকে এদেশ লুটবার সবরকম সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু ইংরেজদের এমন হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিটিও বেশী দিন বাংলার মসনদে থাকতে পারেন নি। কারণ, ইংরেজ আরো চায়– আরো সুযোগ-সুবিধা চায়– আরো অবাধ লুটের ব্যবস্থা করতে চায়। মীরজাফরের পক্ষে তাদের এই বিরাট দাবী মিটানো, এই রাক্ষুসে পেট ভরানো সম্ভব ছিল না। তাই হলওয়েল তাঁকে সরিয়ে মীরজাফরের জামাতা মীর কাশিমকে বাঙলার মসনদে বসালেন। বিলাতে আবার হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো ; কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী যিনি তৈরী করেছেন, আরো একটি হত্যাকাহিনী রচনা করা তাঁর পক্ষে মোটেও কঠিন ছিল না। সুতরাং হলওয়েল এবার রচনা করলেন ঢাকার হত্যা কাহিনী। বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট লিখে পাঠালেন : "নবাব মীরজাফর আলী খাঁর জঘন্য চরিত্রের কথা আর কি বলবো? তিনি ১৭৮৬ সালের জুন মাসে নওয়াজেস মহিষী ঘসেটী বেগম, সিরাজ-জননী আমিনা বেগম প্রমুখ সম্ভ্রান্ত মহিলাকে ঢাকায় রাজ-কারাগারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছেন।" (Long's Selections from the Records of the Government of India — Vol i.)

অথচ হলওয়েল যে সময় ঢাকার হত্যা-কাহিনী রচনা করেন তার পরেও বেগম জীবিত ছিলেন। জীবিত ব্যক্তিদের মৃত বলে প্রচার করা অর্থগুরু হলওয়েলের পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। আপন স্বার্থে এমনতর অলীক কাহিনী রচনা করা সুসভ্য (?) ইংরেজদের পক্ষেই সম্ভব। আর কেনই বা তারা তা না লিখবেন ! মীরজাফরকে পদচ্যুত করে মীর কাশিমকে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসন দান করায় হলওয়েল মীর কাশিম থেকে ৩ লাখ ৯ হাজার ৩ শত ৭০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। (Report of the Committee of the House of Commons —1772)

বহুদিন পর হলওয়েলের স্বদেশবাসী সহযোগিগণই তথ্যানুসন্ধান করে লিখে গেছেন :

> In justice to the memory of the Nabab Meer Jaffier, we think it incumbent on us to acquaint you that the horrible massacres wherewith he is charged by Mr. Holwell in his address to the Proprietors of East India Stock (page 49) are cruel aspersions on the character of that prince, which have not the least foundations in truth. (Letter to Court— 30th September, 1776 supplement,)

অর্থাৎ, মীরজাফরের বিরুদ্ধে রচিত হলওয়েলের ঢাকা হত্যা-কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা।

যে হলওয়েলের পরম উপকারী বন্ধু মীরজাফরকে পদচ্যুত করে এর বৈধতা প্রমাণের জন্য মীর কাশিমের টাকা খেয়ে এমন জঘন্য মিথ্যা হত্যা কাহিনী রচনা করতে

পারেন– এমনকি যে জন্য তিনি স্বদেশী ও স্বজাতির নিকট মিথ্যাবাদী বলে ধিকৃতও হয়েছেন– সেই ব্যক্তি অন্ধকূপ-হত্যার ন্যায় আরেকটি মিথ্যা কাহিনী রচনা করবে, তাতে আশ্চর্যের কি আছে?

হলওয়েল ১৭৪৮ সালে ডাক্তারী করার জন্য বাংলায় আসেন। তাঁর কাজে দক্ষতা দেখে কোম্পানীর কোলকাতা দরবার তাঁকে কোলকাতার কালেক্টর পদে নিযুক্ত করে। এতে তাঁর মাসিক বেতন ধার্য হয় পাঁচ শত টাকা। এছাড়া সেকালের রীতি অনুযায়ী নজর-নেয়াজ, দান-দক্ষিণা এবং পার্বনী প্রভৃতিতেও তাঁর অনেক আয় হতো। বর্ণবিদ্বেষী হলওয়েল এ দেশের 'কালা-আদমীদের' ওপর কঠোর নির্যাতন করতেন। কাশিম বাজারের মুচলিকা পত্রেও এর উল্লেখ রয়ে গেছে। সিরাজের কোলকাতা জয়কালে হলওয়েল তাঁর সর্বস্ব হারান এবং পরে মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর নবাব হয়ে তাঁর প্রতি বিশেষ অনুকম্পা দেখান। মীরজাফর হলওয়েলকে এক লাখ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। (Evidence of Beecher before the Committee of the House of Commons—1772)

এ ছাড়া বিপুল পরিমাণে ক্ষতিপূরণ লাভ করে হলওয়েল কোলকাতার অদূরে ১২ হাজার ৩ শত ৫০ টাকা মূল্যের জমিদারীও কিনে নেন। (Long's Selections—Vol. i. 205) ১৭৬০ সালে তিনি কোলকাতার গভর্নর নিযুক্ত হন। শীঘ্রই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। ফলে সেই বছরই তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। এরপরও হলওয়েল দীর্ঘ দিন বেঁচেছিলেন। ১৭৯৮ সালে বিলাতেই তিনি মারা যান।

এই সব আলোচনায় দেখা যায় যে, হলওয়েল সামান্য অবস্থা থেকে কোলকাতার গভর্নর পদে পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি স্বার্থবাদী ও অর্থগৃধ্নু ছিলেন। স্বার্থোদ্ধারের জন্য তিনি সবকিছু করতে পারেন। কোলকাতা জয়কালে সর্বস্ব হারালেও পলাশীর যুদ্ধের পর তিনি মীরজাফরের দয়া ও কৃপায় বিপুল অর্থ সম্পদ এবং পদগৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন। মীরজাফরের অনুকম্পায় এতটুকু উন্নতিলাভ করেও যে ব্যক্তি আবার মীর কাশিম থেকে তিন লক্ষাধিক টাকা পেয়ে সেই মীরজাফরের বিরুদ্ধে এমন জঘন্য মিথ্যা কলংক রটনা করতে পারেন, তাঁর পক্ষে সর্বস্বান্ত ও কারারুদ্ধ হয়ে প্রতিহিংসা সাধনের জন্য অন্ধকূপ-হত্যার ন্যায় অলীক, অবাস্তব ও অসত্য কাহিনী রচনা করা মোটেও অসম্ভব নয়। শাঠ্য ও ষড়যন্ত্র, উচ্চাভিলাষ আর অর্থগৃধ্নুতা এবং মিথ্যার বেসাতিই ছিল যার একমাত্র কর্ম, তার সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ কখনো অসঙ্গত নয়।

## নবাবের অনুকম্পা

ইংরেজদের উদ্ধত ব্যবহারের যথোচিত প্রতিকারই নবাব সিরাজদ্দৌলার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। নবাব চেয়েছিলেন, দেশে কোনরূপ অশান্তি, বিশৃঙ্খলা এবং গোলযোগের সৃষ্টি না হোক, তাঁর প্রজারা শান্তিতে বসবাস করুক। কিন্তু ইংরেজরা তা হতে দেয়নি। বণিক সেজে এলেও এদেশের রাজদণ্ড কুক্ষিগত করাই তাদের আসল লক্ষ্য ছিল। তাই তারা এদেশে শাঠ্য আর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল, সিরাজকে উত্যক্ত করে তুলেছিল। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে নবাব কোলকাতা দুর্গ আক্রমণ করে ইংরেজদের দর্প চূর্ণ করে দেন এবং হলওয়েল ও তাঁর সঙ্গিগণ কারারুদ্ধ হয়ে রাজধানী মুর্শিদাবাদ প্রেরিত হন।

নবাব সিরাজদ্দৌলা ২রা জুলাই সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রাজধানী মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। সেনাপতি মানিকচাঁদের হাতে কোলকাতার শাসনভার দিয়ে যান। নবাবের আদেশে কোলকাতার নাম রাখা হয় 'আলিনগর'। পথের শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর করার জন্য সিরাজদ্দৌলা হুগলীতে বিশ্রাম নেন এবং সেখানেই নবাবের দরবারও বসে। ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকরা নজরানা সহ দরবারে উপস্থিত হলে নবাব তাদেরকে শান্তিতে বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। এরপর ইংরেজদের কথা ওঠে। ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে বহিষ্কার করা নবাবের অভিপ্রায় নয়– একথা তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে সিরাজদ্দৌলা ওয়াট্স্ এবং কলেট সাহেবকে মুক্তি দেন এবং হলওয়েলের খোঁজ খবর নেন। সেনাপতি মীরমদন পূর্বেই হলওয়েল এবং তাঁর সঙ্গীদের মুর্শিদাবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নবাব তা জানতেন না। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে রাজাজ্ঞা মুলতবি থেকে যায়। এটা হলওয়েল নিজেও বন্ধু ডেভিসের কাছে লেখা পত্রে স্বীকার করেছেন :

> The Nawab, on his return to Hughly, made inquiry for us when he released Messrs. Watts and Colett & C., with the intention to release us also; he had expressed some resentment for having so hastily sent us up to Murshidabad. This proved a very pleasing piece of intelligence to us. (28 February, 1757)

তবে নবাব একটি সাধারণ নির্দেশ জারী করেন যে, এদিক-সেদিক যেসব ইংরেজ লুকিয়ে আছে তাদের বাণিজ্য করাই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে তারা অনায়াসে কোলকাতায় নিজেদের বাসস্থানে ফিরে আসতে পারে। নবাবের এই সাধারণ নির্দেশের খবর শুনে পলায়নপর ইংরেজগণ কোলকাতায় ফিরে আসে, তাদের একান্ত বন্ধু উমিচাঁদ তাদেরকে প্রচুর খাদ্য সরবরাহ করে।

> Two or three days before his departure, he published leave to such as had escaped the dungeon to return to their houses in the town,

where they were supplied with provisions by Omichand, whose intercession had probably procured their return. (Orme —Vol. 11. 80)

নবাব সিরাজদ্দৌলা ১১ই জুলাই মহাসমারোহে রাজধানীতে ফিরে আসেন। রাজধানীতে বিজয়োৎসব চলতে থাকে। আনন্দ-কোলাহল এবং নবাব সেনার সগর্ব আস্ফালনে মুর্শিদাবাদ কেঁপে ওঠে। সেই আনন্দকোলাহলের মধ্য দিয়ে কোলকাতা-বিজয়ী নবাব পাত্রমিত্র সহ নগর প্রদক্ষিণ শেষে মতিঝিল যাচ্ছিলেন, এমনি সময় তিনি হলওয়েলকে দেখতে পান। হলওয়েল বন্দী। সহসা সকল আনন্দ-কোলাহল থেমে যায়। নবাব তাঁর সুসজ্জিত আসন থেকে নেমে পড়েন, পায়ে হেঁটে কারাগারে উপনীত হন, হলওয়েল ও তাঁর সঙ্গিগণকে তৎক্ষণাৎ মুক্তির নির্দেশ দেন এবং পুনরায় দোলারোহণ করেন।

He ordered a Suttaburder and Chopdar immediately to see our irons cut off and to conduct us wherever we chose to go and to take care that we received no trouble nor insult. (Holwell's letter to William Davis Esq,—28 February, 1757)

যে ইংরেজদের প্রতি সিরাজদ্দৌলা এত সহনশীল, যাদের ঔদ্ধত্যে বারবার উত্যক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েও নবাব আবার ক্ষমাশীল, যে হলওয়েলের প্রতি নবাব এতখানি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন, সেই ইংরেজ এবং সেই হলওয়েলের কুটিলতাই সিরাজকে সকলের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করতে সাহায্য করেছে।

## নবাব সিরাজদ্দৌলার পত্র

নবাব সিরাজদ্দৌলা একজন প্রজাহিতৈষী, দেশের কল্যাণকামী এবং বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন। তিনি ইংরেজ-বিদ্বেষী হলেও কখনো অহেতুক ইংরেজদের ওপর যুলুম করেন নি। বারবার ইংরেজরা চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলেও নবাব সবসময়ই তাদের প্রতি সহনশীলতা দেখিয়েছেন। নবাব এবং ইংরেজদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত পত্র বিনিময় হয় তাতেই এর প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

নবাব সিরাজদ্দৌলা রাজধানী মুর্শিদাবাদ ফিরে আসার কয়েক মাস পর ২রা জানুয়ারী ইংরেজরা মানিকচাঁদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আবার কোলকাতা দখল করে নেয়। কোলকাতা দুর্গ আবার ইংরেজদের হস্তগত হয়। বেআইনীভাবে কোলকাতা দখল করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। এরপর তারা হুগলী লুণ্ঠন করে মানুষের বাড়ীঘর সব ভূমিসাৎ করে দেয়, ইংরেজদের এহেন ধৃষ্টতার পরও অধৈর্য না হয়ে সিরাজদ্দৌলা তাদেরকে লিখে পাঠান :

23 January, 1757

You write me, that the King, your master, sent you into India to protect the Company's settlements, trades, rights and privileges ; the intant I received this letter, I sent you an answer ; but it appears to me that my reply never reached you, for which reason I write again.

I must inform you, that Roger Drake, the Company's chief in Bengal, acted contrary to the orders I sent him and encroached upon any authority ; he gave protection to the King's subjects who absented themselves from the inspection of the Durbar, which practice I did forbid, but to no purpose. On this account. I was determined to punish him and accordingly expelled him from my country ; but it was my inclination to have given the English Company permission to have carried on their trade as formerly, had another chief been sent here; for the good therefore of these provinces and the inhabitants, I send you this letter and if you are inclined to re-establish the Company, only appoint a chief and you may depend upon my giving currency to their commerce upon the same terms as heretofore enjoyed. If the English behave themselves like merchants and follow my orders, they may rest assured of my favour, protection and assistance." (Ive's Journal)

এ পত্রখানির মর্ম হলো

২৩শে জানুয়ারী, ১৭৫৭

তুমি লিখেছ যে, তোমার প্রভু এবং রাজা কোম্পানীর কারবার ও তার অধিকার রক্ষার জন্যেই তোমাকে ভারতে পাঠিয়েছেন। আমি এই পত্র পাওয়া মাত্রই তা পাঠ করি এবং এর জবাব দেই। এখন দেখছি আমার জবাব তোমার কাছে পৌছেনি, তাই আবার লিখছি।

আমি তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই– বাংলায় কোম্পানীর অধ্যক্ষ রজার ড্রেক আমার নির্দেশের বিপরীত আচরণ করে আমার ক্ষমতা অতিক্রম করেছিল ; দরবারে আমার যেসব প্রজা হিসেব নিকেশ দেয়ার ভয়ে পালিয়ে যায় তাদেরকে সে আশ্রয় দিয়েছিল ; আমি নিষেধ করেও এরূপ কাজ থেকে তাকে বিরত রাখতে পারিনি। একমাত্র এ কারণেই আমি শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম এবং আমার রাজ্য থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ইংরেজরা অপর কাউকে অধ্যক্ষ করে পাঠালে আমি আগের মতোই তাদের বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করবো বলেই ইচ্ছা ছিল। সুতরাং দেশ এবং দেশবাসিগণের মঙ্গলের জন্য এই পত্র লিখছি– যদি এ দেশে কোম্পানীর বাণিজ্য পুনঃ সংস্থাপিত করাই তোমাদের ইচ্ছা হয়, তবে একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত কর– তাহলে পূর্বের প্রচলিত নিয়মে বাণিজ্য পরিচালনার আদেশ পাবে। ইংরেজরা যদি বণিকের ন্যায় ব্যবহার করে এবং আমার নির্দেশ অনুযায়ী চলে, তবে তারা যে আমার অনুগ্রহ, রক্ষাব্যবস্থার সুবিধা এবং সহায়তা লাভ করবে, এ বিষয়ে তারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

এ পত্রে নবাব সিরাজের চরিত্রের যে পরিচয় আমরা পাই– তাতে একজন সত্যিকার শান্তিপ্রিয়, প্রজাহিতৈষী, ন্যায়পরায়ণ এবং বিচক্ষণ নরপতির চরিত্রই ফুটে উঠে। কিন্তু কথায় বলে, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। এই পত্র ইংরেজদের হাতে পৌছার অনেক আগেই তারা কোলকাতা দখল ও হুগলী লুণ্ঠন করে এবং সদর্পে দুর্গে উন্মাদ আনন্দে মেতে ওঠে। তাই ওয়াট্‌সন্ আন্তর্জাতিক নীতিকে পদদলিত করে, নির্লজ্জের মতো আস্ফালন করে নবাবের পত্রের জবাব লিখেছিল–

You told me in your letter, that the reason of your expelling the English out of their countries was the bad behaviour of Mr. Drake, the Company's chief in Bengal. But besides that, Princes and Rulers of States, not seeing with their own eyes, nor hearing with their own ears, are often misinformed and the truth (is) kept from them by the arts of Cafty and wicked men was it becoming the justice of a Prince to punish all for one man's sake? Or to ruin and destroy so many innocent people as had no way offended, but

who relying on our Royal Phirmund, expection and protection security both to their property and lives, instead of oppression and murder, which they unhappily found? Are these actions becoming the justice of a Prince? Nobody will say they are. They can only then have been caused by men, who have misrepresented thing to you through malice or for their own private ends, for great Princes delight in acts of justice and in shewing mercy.

If therefore you are desirous of meriting the fame of a great Prince and lover of justice, show your abhorrence of these proceeding, by punishing those evil counsellors who advised them; cause satisfaction to be mad to the Company and to all others who have been deprived of their property and by these acts turn off the edge of the sword which is ready to fall on the heads of your subjects.

If you have any cause of complaint against Mr. Drake, as it is but just that the master alone should have a power over his servant, send your complaints to the company and I will answer for it they will give you satisfaction.

Although I am a soldier as well as you, I had rather received satisfaction from your own inclination to do justice, than be obliged to force it from you by the distress of your innocent subjects. (Ive's Journal)

পত্রখানি সিরাজদ্দৌলার নিকট পৌঁছার আগেই ইংরেজদের হুগলীর লুণ্ঠন কাহিনী তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল। ইংরেজদের এই উদ্ধত ব্যবহারে এমনিতেই তিনি ক্ষুব্ধ-তার ওপর আবার ওয়াট্সনের এই পত্র! ধর্মোপদেষ্টার বেদীতে বসে হুমকির সুরে নবাবকে নসিহত! ওয়াট্সনের মতে, সিরাজদ্দৌলা অপরের কথায় নির্ভর করে ইংরেজদের সর্বনাশ করছিলেন, ড্রেক সাহেবের উদ্ধত ব্যবহারের জন্য কোম্পানীর কাছেই নবাবের নালিশ করা উচিত ছিল। তা না করে নিজে নিজেই ড্রেক সাহেবকে শাস্তি দেয়া সিরাজের বড়ই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু ওয়াট্স্ন ভুলে গেছেন সিরাজদ্দৌলা যে দেশের নবাব, তিনি সেই দেশের একদল বিদেশী সওদাগরের গোমস্তা মাত্র। অবশেষে দেশে শাসনক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠা, আত্মমর্যাদা রক্ষা এবং অসহায় প্রজাদের জানমালের হেফাজতের জন্য সিরাজদ্দৌলা গত্যন্তর না দেখে আবার যুদ্ধযাত্রা করতে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি ক্রোধান্ধ হয়ে স্বীয় কর্তব্য ভুলে যাননি। মুসলমান নবাব বারবার উত্যক্ত হয়েও কতদূর সহনশীল ও ক্ষমাশীল হতে পারেন, তা বোঝানোর জন্য ওয়াট্সনকে লিখে পাঠালেন-

You have taken and plundered Hughly and made war upon my subjects ; these are not acts 'becoming merchants'! I have therefore, left Murshidabad and am arrived near Hughly; I am likewise crossing the river with my army, part of which is advanced towards your camp. Nevertheless, if you have a mind to have the Company's business settled upon its ancient footing and to give a currency to their trade, send a person of consequence to me who can make your demands and treat with me upon this affair. I shall not scruple to grant a Perwanah for the restitution of all the Company's factories and permit them to trade in my country upon the same terms as formerly. If the English, who are settled in this Provinces, will behave like merchants, obey my orders and give me no offence, you may depend upon it, I will take their loss into consideration and adjust matters to their satisfaction.

You know how difficult it is to prevent soldiers from plundering in war ; therefore, if you will, on your part relinquish somethings of the damages you have sustained by being pillaged by my army, I will endeavour to give you satisfaction even in that particular in order to gain your friendship and preserve a good understanding for the future with your nation.

Your are a Christian and know how much preferable it is to accommodate a dispute, then to keep it alive : but if you are determined to sacrifice the interest of your Company and the good of private merchants to your inclination for war, it is on fault of mine. To prevent the fatal consequence of such a ruinous war. I write this letter. (Ive's Journal)

**সিরাজের পত্রের অনুবাদ**

তোমরা হুগলী লুণ্ঠন করেছ, আমার প্রজাদের সঙ্গে লড়েছ। এটা কখনো সওদাগরের উপযুক্ত কাজ হয়নি। সুতরাং বাধ্য হয়ে আমাকে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে হুগলীর সন্নিকটে আসতে হয়েছে। আমি আমার সেনাবাহিনী নিয়ে নদী পার হচ্ছি। এর এক অংশ তোমাদের শিবিরের দিকে অগ্রসর হয়েছে। তবুও বলছি কোম্পানীর বাণিজ্য পূর্ব-প্রচলিত নিয়মে পরিচালিত করবার ইচ্ছা এবং বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ থাকলে এমন একজন প্রতিনিধি পাঠাতে পার, যে তোমাদের দাবীর কথা বুঝিয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ও চুক্তির ব্যবস্থা করতে পারবে। আমার

রাজ্যে কোম্পানীর কুঠি পুনরায় চালু ও পূর্ব নিয়মে বাণিজ্য আবার শুরু করবার আদেশ দিতে আমি বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করবো না। এদেশে বসবাসকারী ইংরেজরা যদি বণিকের মতো ব্যবহার করে, আমার আদেশ মানে এবং আমাকে উত্যক্ত না করে– আমি তাদের ক্ষতি সম্পর্কে বিবেচনা করবো ও তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা যে করবো সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

যুদ্ধের সময় সৈন্যদেরকে লুটতরাজ থেকে নিবৃত্ত রাখা যে কি কঠিন ব্যাপার, তা অবশ্যই তোমারও জানা আছে। সুতরাং আমার সৈন্যদল দ্বারা যা কিছু লুণ্ঠিত হয়েছে– সে বিষয়ে দাবী আংশিকভাবে যদি তুমি ত্যাগ করতে পারো তবে তোমাদের সাথে ভবিষ্যতে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য স্থাপনের আশায় আমি সে বিষয়টিও বিবেচনা করবো এবং তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে দেব।

তুমি একজন খ্রীস্টান। বিবাদকে জিইয়ে না রেখে তা মীমাংসা করে ফেলে শান্তি স্থাপন করা যে কত কল্যাণকর, তা অবশ্যই তুমি উপলব্ধি করতে পার। কিন্তু তা না করে তোমরা যদি কোম্পানী এবং অন্যান্য বণিকদের বাণিজ্য স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে যুদ্ধ করার জন্যই বদ্ধপরিকর হয়ে থাকো, তবে সেক্ষেত্রে আমি মোটেই দায়ী হবো না। সেরূপ সর্বনাশা যুদ্ধের অশুভ পরিণাম পরিহার করার উদ্দেশ্যেই আমার এই পত্র লেখা।

যুদ্ধ বাধলে দেশের সর্বনাশ হয়। সর্বত্র বিপর্যয় দেখা দেয়, শিল্পবাণিজ্য, কাজ-কারবার দারুণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সিরাজ মনে প্রাণে তা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই সন্ধি স্থাপনের জন্য ওয়াট্‌সনের কাছে তাঁর এই পত্র লেখা। এতে তাঁর শান্তিপ্রিয়তা ও ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে এবং সহনশীল মনোভাবই ফুটে উঠেছে।

যা হোক, নবাব সসৈন্যে আবার কোলকাতায় উপস্থিত হয়ে উমিচাঁদের সাহত পুষ্পোদ্যানেই দরবার বসান। ইংরেজদের দু'জন প্রতিনিধিও দরবারে আসেন। নবাব তাঁদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখান এবং সন্ধি স্থাপনের জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। উপস্থিত ইংরেজ-প্রতিনিধিদ্বয়ও সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি জানালে নবাবের কুচক্রী মন্ত্রীদল আশাহত ও আতংকিত হয়ে ওঠেন। ইংরেজ প্রতিনিধিদ্বয় দরবার থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরই সুচতুর উমিচাঁদ নেহায়েত আপনজনের ন্যায় তাঁদের কানে কানে বলতে থাকে :

দেখিতেছ কি? প্রাণ বাচাইতে চাহ তো এখনই পলায়ন কর। সন্ধির প্রস্তাবে নিশ্চিন্ত হইয়াছ ? এ সন্ধি নহে– ইহা কেবল কালহরণের কুটিল কৌশল ! নবাবের সেনাদল আসিয়াছে ; কিন্তু কামানগুলি এখনো পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। সেইজন্য তোমাদিগকে সন্ধির কথা উঠাইয়া প্রতারিত করিতেছে। কামান আসিলে আর এক

মুহূর্তও বিলম্ব হইবে না। তোমরা ক'জন? সিরাজদ্দৌলা সেনা-তরঙ্গের সম্মুখে কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারিবে? (সিরাজদ্দৌলা, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, পৃ. ২৮১-৮২)

কুমন্ত্রণায় কাজ হয়েছিল। নিদারুণ শীতের রাত্রি। নবাব সেনারা তখন ঘোর নিদ্রায় মগ্ন। এই অবস্থায় হঠাৎ ইংরেজরা হামলা শুরু করে দেয়। নবাব সেনারা জেগে উঠার পর নবাবের কামানগুলো থেকে প্রচণ্ড বেগে গোলা বর্ষিত হতে থাকে। ফলে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। সিরাজদ্দৌলার কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবার পর তিনি নিরাপদ স্থানে গিয়ে শিবির সন্নিবেশ করে ইংরেজদেরকে আবার সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠান। রণে ভীত ক্লাইভ সন্ধিতে সম্মত হলেও ওয়াট্সন্ এতে অসম্মতি জানান। ক্লাইভকে তিনি সাবধান করে দিয়ে লিখলেন–

I am fully convinced that Nabab's letter was only to assume us in order to cover his retreat and gain time till he is reinforced, which may be attended with very fatal consequences. For my own part, I was of opinion that attacking his rear when he was marching off and forcing him to abandon his cannon, was a most necessary piece of service to bring him to an accommodation ; for till he is well-thrashed don't sir flatter yourself he will be inclined for peace. Let us therefore not be overreached by his politics but make use of our arms which will be much more prevalent than any treaties or negotiations.

কিন্তু ক্লাইভ এতে কান না দিয়ে সন্ধি করতে রাজী হয়ে গেলেন। অবশেষে ১৭৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় ইতিহাসে তারই নাম 'আলিনগরের সন্ধিপত্র'। এই সন্ধি অনুযায়ী ইংরেজরা এ দেশে বাণিজ্যের অধিকার পুরোপুরি ফিরে পায়।

সিরাজদ্দৌলা আলিনগর সন্ধির পর নিশ্চিন্ত মনে মুর্শিদাবাদ রওয়ানা হন। কিন্তু অগ্রদ্বীপে এসেই খবর পান যে, ইংরেজরা চন্দনগর লুণ্ঠনের আয়োজন করছে। নবাব বিরক্তি প্রকাশ করলে ধূর্ত উমিচাঁদ ইংরেজদের পক্ষ হয়ে সিরাজদ্দৌলার সামনেই ব্রাহ্মণের পা ছুঁয়ে শপথ করে বলেন যে, "ইংরেজরা কখনো সন্ধিভঙ্গ করবে না, তাদের ন্যায় সত্যপ্রিয় জাতি সারা দুনিয়ায় আর নেই, তাদের যে কথা সেই কাজ।" (Orme. Vol.ii.137) দেবতার নামে শপথ করায় সিরাজ নিরস্ত হন। তবুও তিনি ইংরেজদেরকে সাবধান করে ওয়াট্সনের কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন–

সকল কলহ-বিবাদ সমূলে ধ্বংস করার জন্যই তোমাদের সঙ্গে সন্ধি করলাম– বাণিজ্যাধিকার দিলাম ফিরিয়ে। তুমিও তাতে স্বাক্ষর করেছিলে– প্রতিজ্ঞা

করেছিলে, এদেশে আর যুদ্ধ-কলহের সৃষ্টি করবে না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, তোমরা হুগলির অদূরে অবস্থিত ফরাসী কুঠি আক্রমণ করে শীঘ্রই সমরানল জ্বালিয়ে তুলবে। আমার রাজ্যে আবার কলহ সৃষ্টির আয়োজন করছ কেন? এটা তো সকল দেশ তথা আন্তর্জাতিক নীতিবিরুদ্ধ আচরণ। তৈমুরলঙ্গের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ফিরিঙ্গিরা তো কোনদিনই এদেশে লোকদের মধ্যে যুদ্ধ-কলহ সৃষ্টি করতে পারেনি। যুদ্ধ বাধানোই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে আমি আর কি করবো? বাদশাহের কর্তব্যপালন ও সম্মান রক্ষার জন্য আমাকে বাধ্য হয়েই সসৈন্যে ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করতে হবে। এই সেদিন মাত্র তোমরা সন্ধি করেছ, এরই মধ্যে আবার যুদ্ধ? মহারাষ্ট্রীয়েরা বহুকাল শান্তিভঙ্গ করেছিল, কিন্তু যেদিন সন্ধি করলো, সেদিন থেকে আর কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনি। ভবিষ্যতেও আর করবে বলে মনে হয় না। ধর্ম-শপথপূর্বক সন্ধি করেছ, জেনেশুনে এর বিপরীত আচরণ করা গুরুতর অপরাধ। তোমরা সন্ধি করেছ, সুতরাং এ সন্ধি পালন করতে বাধ্য। সাবধান! যেন আমার রাজ্যে যুদ্ধ-কলহ সৃষ্টি না হয়। আমি যা যা ওয়াদা করেছি, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবো। (Ive's Journal)

অবশ্য পত্র পাঠালেও নবাব ইংরেজদেরকে আর বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাই মহারাজ নন্দকুমারের অধীনে হুগলী, অগ্রদ্বীপ এবং পলাশীতে সৈন্য সমাবেশ করে তিনি রাজধানীতে ফিরে আসেন। সেখানে এসেই নবাব খবর পান যে, ইংরেজরা সসৈন্যে চন্দননগর আক্রমণ লুণ্ঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সিরাজদ্দৌলা ওয়াট্‌সনের কাছে এই মর্মে একখানা পত্র লেখেন–

গতকাল তোমাকে যে পত্র লিখেছি, তা বোধ হয় পেয়েছ। সেই পত্র লেখার পরই ফরাসীদের মুখপাত্রের নিকট জানতে পারলাম যে, তোমরা নাকি অতিরিক্ত চার-পাঁচখানি যুদ্ধ-জাহাজ আনিয়েছ এবং আরো আনবার চেষ্টায় আছ। এটাও শুনলাম যে, তোমরা শুধু চন্দননগর ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হবে না, বরং বর্ষাশেষে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ পর্যন্তও আসবে। এটা কি বীরোচিত কিংবা ভদ্রোচিত আচরণ? সন্ধি পালন করার ইচ্ছে থাকলে জাহাজগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেবে। এইতো সেদিন মাত্র সন্ধি করেছ! এত অল্প দিনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি ভদ্রনীতি? তোমাদের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়দের বাইবেল নেই ; কিন্তু কই তা সত্ত্বেও তো তারা সন্ধি শর্ত লংঘন করেনি ! বড়ই আশ্চর্যের কথা। সহসা বিশ্বাস করতেও দ্বিধা জাগে– বাইবেলের ধর্মশিক্ষা করে, মহাপ্রভু এবং যীশুখৃস্টের দোহাই দিয়ে সন্ধি করেছো– প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছো, অথচ কার্যকালে তা পালন করছো না। (Ive's Journal)

সিরাজদ্দৌলার এই ব্যঙ্গাত্মক ও সুতীব্র ভাষায় লিখিত পত্রের বাক্যবাণে ইংরেজগণ

কিছুটা বিচলিত হয়ে ওঠে, বোধহয় কিছুটা লজ্জাও তারা পেয়েছিল। চরম মুনাফেকী ও শঠতার আশ্রয় নিয়ে ওয়াট্সন পত্রের জবাব দিলেন–

আপনার ১৯শে ফেব্রুয়ারীর পত্র আজ ২১ শে ফেব্রুয়ারী আমার হাতে পৌঁছালো। পত্র পড়ে জানতে পারলাম যে, ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা আপনার অভিপ্রেত নয়। এতে আপনি যে এতদূর অসন্তুষ্ট হবেন, আগে তা জানতে পারলে আমরা কখনো আপনার রাজ্যে শান্তিভঙ্গের আয়োজন করতাম না। ফরাসীরা যদি সন্ধি করে, তবে আমরা আর যুদ্ধ চাই না। কিন্তু শুধু তারা সন্ধি করলেই আমরা ছাড়বো না, সুবাদার হিসেবে আপনাকে এর জামিন থাকতে হবে। সারা দুনিয়ায় আমাদের ন্যায় সত্যপরায়ণ জাতি যে আর কোন দেশে নেই তা বোধ হয় আপনার জানা আছে। আমি আপনাকে সত্যশপথ করে বলছি, আমরা কিছুতেই সত্যলঙ্ঘন করবো না। প্রভু যীশুখৃস্ট এবং মহান স্রষ্টাকে সাক্ষী রেখে আবার বলছি যে, আপনি যদি ফরাসীদের সঙ্গে সন্ধি করিয়ে দেন, তবে আমরা আর কিছুতেই সত্য ভঙ্গ করবো না। (Ive's Journal)

সিরাজদ্দৌলা এদেশের নবাব। তাঁর রাজ্যে ইংরেজরা কোনরূপ কলহ-বিবাদের সৃষ্টি করবে না বলে নিজেরা ওয়াদা করেছে, সন্ধি করেছে। এই ওয়াদা এবং সন্ধি মানতে তারা বাধ্য। ফরাসীরাও নবাবের আশ্রিত। নবাব বলতে পারতেন, ফরাসীদের সাথে তোমাদের সন্ধি হোক বা না হোক, এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? সন্ধি অনুযায়ী আমার রাজ্যে তোমরা গোলযোগ সৃষ্টি করতে পার না। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা সেদিকে যান নি এবং কুটনীতি ও যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নেন নি। কেননা, তিনি চেয়েছিলেন শান্তি, জনগণের কল্যাণ আর দেশের সমৃদ্ধি। তাই যে কোন উপায়ে যুদ্ধকে পরিহার করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। সুতরাং ওয়াট্সনের পত্রে সম্মতি প্রকাশ করে সিরাজদ্দৌলা তাঁকে লিখেছিলেন–

ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ সংক্রান্ত তোমার পত্র পেয়ে তার মর্ম অবগত হলাম। আমি ফরাসীদের কলহ বৃদ্ধির সহায়তা করবো না, সেজন্য নিশ্চিন্ত থাকো। বরং তারাই যদি গায়ে পড়ে বিবাদ বাধানোর প্রয়াস পায়, তবে সসৈন্যে তাতে বাধা দেবো। তোমরা চন্দননগর আক্রমণ করবে শুনে যা সঙ্গত মনে হয়েছিল, তা-ই লিখে পাঠিয়েছিলাম। ফরাসীদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য আমি সেনাদল পাঠাইনি। তোমরা কলহবিবাদ বাধালে আমারই প্রজাদের সর্বনাশ হবে, সুতরাং প্রজাদের রক্ষার জন্যই (স্থানে স্থানে) সেনা-সমাবেশ করেছিলাম। আমার পত্র পেয়ে তোমরা চন্দননগর আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করেছ– এই খবর শুনে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি।। সন্ধি করার জন্য ফরাসীদের কাছে পত্র লিখেছি। সন্ধি হলে আমি একজন রাজকর্মচারী পাঠিয়ে দেবো এবং তোমাদের সন্ধিপত্র আমার দফতরে জারি

করিয়ে রাখবো। মিত্রভাবে থাকার জন্যই সন্ধি করেছি– সে কথার কখনো অন্যথা হবে না।

আর এক কথা। দিল্লীর ফৌজ আমার রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে বলে শুনছি। সেজন্য বোধ হয় শীঘ্রই পাটনায় যাবো। সে সময় তোমরা সৈন্য দিয়ে সাহায্য করলে লাখ টাকা পুরস্কার দেব। (Ive's Journal)

কিন্তু ওয়াট্‌স্‌ন নিজের কথা রাখেন নি। তাই সন্ধিও হয়নি। ক্লাইভসহ সকল ইংরেজ সন্ধিতে সম্মত ছিলেন। তাঁরা সবাই সম্মতিদান করে ওয়াট্‌সনের নিকট পর পর তিনবার সন্ধিপত্র পাঠান এবং ওয়াট্‌সন তিনবারই তা ফিরিয়ে দেন। সুতরাং ফরাসীদের সঙ্গে এ সন্ধিও আর হয়নি। এ ব্যাপারে ওয়াট্‌সনের গোঁয়ার্তুমির কথা স্বয়ং ক্লাইভের কথায় শুনুন–

Do but reflect gentlemen, what will be the opinion of the world of these our late proceedings. Did we not in consequence or a letter received from the Governor and Council of Chandannagar making offers of a neutrality within the Ganges, in a manner accede to it by desiring they would send deputies and that we would gladly come into such a neurtality with them and have we not since their arrival drawn out Articles that were satisfactory to both parties and agreed that each Article should be reciprocally signed, sealed and sworn to? What will the Nabab think? After the promises made him on our side and after his consenting to guarantee this neutrality, he and all the world will certainly think that we are men of a trifling, insignificant disposition or that we are men without principles. It is, therefore, incumbent on us to exculpate ourselves by declaring the real truth, that we were entirely ignorant of Mr. Watson's intentions to refuse the neutrality in the manner proposed and settled by us and that we always thought him of contrary opinion to what his letter declare. I am persuaded these must be the sentiments of the gentlemen of the committee or they never would have gone such lengths as must expose them to the censure of all reasonable men. (Select Committee Proceeding. 4 March, 1757)

অর্থাৎ এখানে ক্লাইভ বলছেন,–

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা একবার ভেবে দেখুন– আমাদের এসব আচরণ সম্বন্ধে দুনিয়ার লোকদের মনে কিরূপ ধারণার সৃষ্টি হবে? গঙ্গার উপকূলবর্তী রাজ্যে

নিরপেক্ষভাবে বাণিজ্য করবার নিয়মে চন্দননগরের কাউন্সিল এবং গভর্নরের প্রস্তাব পেয়ে,– তাঁরা প্রতিনিধি পাঠালে আমরা সম্মত হবো ও তাঁদের সাথে নিরপেক্ষভাবে বাণিজ্যাধিকার রক্ষা করবো বলে আমরা কি প্রকারান্তরে নিজেদের অভিমত জানিয়ে দেইনি? তাঁরা আসার পর সন্ধির নিয়ম উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে লিখিত হবে, উভয় পক্ষ তাতে স্বাক্ষরদান করবে এবং তা গৃহীত হবে বলে কি স্থিরীকৃত হয় নি? নবাব কি ভাববেন? আমরা তাঁকে কথা দিয়েছি এবং তিনিও সন্ধির শর্ত পালন ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এসবের পর এখন তিনি এবং সারা দুনিয়ার লোক অবশ্যই মনে করবে যে, আমাদের সংকল্প তুচ্ছ ও নড়বড়ে, মূলনীতি বলতে আমাদের কিছুই নেই, নেই কোন ধর্মাদর্শ। আমাদের যে এতে অপরাধ নেই, তা দেখানোর জন্য আসল সত্য কথা বলে রাখা ভালো,– আমরা সন্ধির নিয়ম নির্দিষ্ট ও স্থির করেছি। কিন্তু এরপর ওয়াট্সন যে এরূপভাবে তা প্রত্যাখ্যান করবেন তা আমরা কেউই ধারণা করতে পারিনি। তার পত্রে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়, তাঁর অভিপ্রায় এর সম্পূর্ণ বিপরীত বলে আমরা সব সময় মনে করতাম। আমি নিশ্চিত যে, কমিটির সকল সদস্য অবশ্য এরূপই ভাবছেন। তা না হলে সমগ্র জ্ঞানী ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের ভর্ৎসনার পাত্র হওয়ার জন্য আপনারা এতদূর করতেন না।

ওয়াট্সন ভেবেছিলেন, সিরাজদ্দৌলা দিল্লীর ফৌজের আগমনের খবর শুনে খুবই ঘাবড়িয়ে গেছেন, ভীত-ত্রস্ত ও আতংকিত হয়ে উঠেছেন। সুতরাং এ দুঃসময়ে দায়ে পড়েই নবাব ইংরেজদেরকে চন্দননগর লুণ্ঠনের অনুমতি দিবেন। তাই তিনি সন্ধিতে রাজী হননি এবং এই ধারণা নিয়েই তিনি নবাবকে লিখে পাঠান :

চন্দননগরের ফরাসী দুর্গে অনেক সৈন্য রয়েছে। তাদেরকে পিছনে রেখে আমরা দূরদেশে যুদ্ধ করতে যেতে পারি না। আপনি অনুমতি দিলেই আমরা ফরাসীদেরকে নির্মূল করে সসৈন্যে আপনার সাথে পাটনা যেতে পারি। (Ive's Journal)

ওয়াট্সনের বিশ্বাস দৃঢ়, নবাব দিল্লীর ফৌজের আক্রমণের খবরে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাই তিনি কয়েকদিন অনুমতির অপেক্ষায় থেকে আরো একটু কঠোর মনোভাব নিয়ে লিখেছেন :

স্পষ্ট কথা বলার সময় এসেছে। শান্তি রক্ষা করা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, অসহায় প্রজাদের জানমাল রক্ষা যদি আপনার রাজধর্ম হয়, তবে আজ থেকে দশ দিনের মধ্যে আমাদের পাওনা শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত আদায় করে দিবেন। এর বিপরীত আচরণ করলে সমূহ দুর্ঘটনা উপস্থিত হবে। আমরা এ পর্যন্ত কেবল সরল ব্যবহার করে আসছি। এখনো সরল ব্যবহার করার নিয়তেই বলছি যে, আমাদের

অবশিষ্ট সেনাদল শীঘ্রই কোলকাতায় উপনীত হবে এবং দরকার মনে করলে আরো ফৌজ ও জাহাজ নিয়ে আসবো। এদের সহায়তায় এদেশে এমন ভয়ানক যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে তুলবো, গঙ্গার সমস্ত পানি ঢেলেও আপনি তা নিভাতে পারবেন না। আপাততঃ বিদায় নিচ্ছি কিন্তু যিনি জীবনে কারো সঙ্গে কথার অন্যথা করেন নি, তিনিই যে নিজের হাতে এই পত্র লিখেছেন, তা যেন কখনো ভুলে না যান।

সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের উদ্দেশ্য ধরে ফেললেন। ওয়াট্‌সনকে লিখে পাঠালেন–

তোমাদের কাছে যে সৈন্য সাহায্য চেয়েছিলাম, তার কি হলো? সন্ধি-পত্রের অঙ্গীকৃত অর্থ শীঘ্রই পাঠিয়ে দিচ্ছি। দোলযাত্রা উপলক্ষে রাজ-কর্মচারিগণ উৎসবে ব্যস্ত ছিলেন বলেই শুধু এতদিন দেরী হয়েছে। সন্ধি ভঙ্গ করার অভ্যেস আমার নেই। যা স্বীকার করেছি, তা অবশ্যই দেব। বাক্‌চাতুরী করে কাল হরণ করবে না। কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করলে আমি তোমাদেরকে সহায়তা করবো। আমি এ পর্যন্ত ফরাসীদেরকে এক কপর্দকও সাহায্য করিনি। শুধু প্রজারক্ষার খাতিরে হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারের নিকট কতগুলো ফৌজ পাঠিয়েছি। এদেশের চিরাচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করে আমার অধিকারে কোনরূপ যুদ্ধ-কলহ না বাধাও– এটাই আমার একান্ত অনুরোধ। (Ive's Journal)

ইংরেজগণ ভালভাবেই বুঝলেন, সিরাজদ্দৌলা কিছুতেই তাঁর রাজ্যে যুদ্ধের অনুমতি দিবেন না। সুতরাং ওয়াট্‌সন এবার আরেক কৌশলের আশ্রয় নিলেন। তিনি সিরাজদ্দৌলাকে লিখলেন যে, ফরাসীদের দোষেই সন্ধি হয়নি, তারা এরূপ চরিত্রেরই লোক। সুতরাং তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত– ওয়াট্‌সন সে সম্পর্কে নবাবের মত চান। সিরাজদ্দৌলা সাধারণভাবেই এর উত্তর দেন : ১৩ই মার্চ, ১৭৫৬

আমার পত্র পেয়ে যে জবাব দিয়েছ– আমি তা পেয়েছি। তুমি লিখেছ যে, তোমাদের সকল সন্দেহ দূর হয়েছে ; আমার পত্র পেয়ে চন্দননগর আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করেছ। ফরাসীদের সঙ্গে সন্ধিপত্রের লেখাপড়াও শেষ করেছিলে। কিন্তু ফরাসীরা স্বাক্ষরদানের সময় নাকি বলেছে যে, তাদের সেনাপতিগণ এই সন্ধি পালন করবেন কিনা, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। একজন ফরাসী স্বাক্ষর করার পর অন্যজন এসে তা না মানলে তাদেরকে আর কি করে বিশ্বাস করা যায়? সে যা-ই হোক, আমার অধিকারে যুদ্ধ-কলহ বাধাতে দিতে আমি কখনো রাজী নই। কারণ, ফরাসীরাও আমার প্রজা। তোমাদের ভয়েই তারা আমার শরণাপন্ন হয়েছে। সেজন্যই আমি সন্ধি করতে বলেছিলাম। তাদেরকে অনুগ্রহ দেখানো কিংবা সহায়তা করার কোন অভিসন্ধি আমার ছিল না। তুমিও তো একজন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সদাশয় ও মহাত্মা, তুমিই বিচার করে দেখ, পরম শত্রুও যদি শরণাগত হয়, তবে তাকে প্রাণভিক্ষা দান কর কিনা ? তার সরলতায় যদি সন্দেহ না থাকে, তবে তুমি

তাকে দয়া করে থাক। অবশ্য সরলতায় সন্দেহ হলে অন্য কথা– তখন যা বোঝো, সেরূপ আচরণ করে থাক। (Ive's Journal)

এই পত্রের কোথাও চন্দননগর আক্রমণের কোনরূপ অনুমতির নামগন্ধও নেই। অথচ ওয়াট্‌সন এই পত্রকেই নবাবের অনুমতি পত্র বলে প্রকাশ করেন। ক্লাইভ ঘুষ দিয়ে নন্দকুমারকে সসৈন্যে দূরে সরে যেতে বাধ্য করেন এবং ফরাসীদের ওপর হামলা চালান। ফরাসীরা পরাজিত হয়। চন্দননগর লুণ্ঠিত হয়। চন্দননগর ধ্বংস করার পর ওয়াট্‌সন নবাবকে লিখেন :

আমি যে গুরুতর কাজের জন্য এখানে (চন্দননগর) এসেছি, তাতে খুবই ব্যস্ত ছিলাম। তাই আপনার কয়েকটি পত্র পেয়েও যথাসময়ে উত্তর দিতে পারিনি। এজন্য দোষ নেবেন না। আমাদের সৌভাগ্য বলে, আপনার সৌহার্দ্য-সহায়তায় এবং মহাপ্রভু মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় মাত্র দু'ঘণ্টা যুদ্ধের পরই আমরা ২৩শে মার্চ চন্দননগর দখল করে নিয়েছি। ফরাসীরা অনেকেই বন্দী হয়েছে, যারা পালিয়ে গেছে, তাদের ধরে আনার জন্যে সশস্ত্র লোক নিয়োগ করেছি। তারা অন্য কারো ওপর কোন উপদ্রব করবে না। সুতরাং এ জন্যে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না। আমরা যে সন্ধি পালন করতে কিছুমাত্র ত্রুটি করবো না, সে কথা বারবার বলেছি। আপনার শত্রু যখন আমাদেরও শত্রু, তখন আমাদের শত্রুও অবশ্যই আপনার শত্রু বলে পরিগণিত হবে ; সুতরাং ফরাসীরা আপনার কাছে উপস্থিত হলে, অবশ্যই আপনি তাদেরকে বেঁধে পাঠিয়ে দেবেন। আপনি লিখেছেন যে, ড্রেক সাহেব মহারাজ মানিকচাঁদকে অপমান করেছিলেন। আমি তা শোনামাত্র ড্রেক সাহেবকে যথোচিত লিখেছি এবং তিনিও মানিকচাঁদের কাছে যথারীতি মাফ চেয়েছেন। ভরসা করি, আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমরা কি কখনো আপনাকে অসন্তুষ্ট করতে পারি? আমাদের কাছে সেরূপ ব্যবহার কখনো পাবেন না। (Ive's Journal)

সিরাজদ্দৌলা ওয়াট্‌সনের পত্রের কোন আমলই দিলেন না। ফরাসীরা তাঁর আশ্রিত। সুতরাং কেন তাদেরকে অন্যায়ভাবে বেঁধে পাঠাবেন ! ওয়াট্‌সন ভয় দেখিয়ে উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি আবার লিখলেন :

আমরা চন্দননগর দখল করেছি, অধিকাংশ ফরাসী বন্দী হয়েছে, যারা পালিয়ে গেছে তাদের গ্রেফতারের জন্যে ফৌজ পাঠিয়েছি– এসব কথা এর আগেই লিখেছি। আবার যে তা লিখতে হচ্ছে, এটা বড়ই আক্ষেপের কথা। আপনাদের আল্লাহ্ এবং মুহম্মদ (সা)-এর পবিত্র নামে আপনি ধর্ম-প্রতিজ্ঞা করেছেন, –তা পালন করেন না দেখেই আমাকে বারবার লিখতে হচ্ছে। কোম্পানীর যেসব কামান আপনার দখলে রয়েছে তা ওয়াট্‌স সাহেবকে ফিরিয়ে দেবেন। বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যেই সন্ধি করেছেন– তা কখনো ভুলে যাবেন না। পলায়িত ফরাসীদেরকে

অবিলম্বে বেঁধে পাঠিয়ে দেবেন। এর বিপরীত আচরণ করার পরামর্শ কেউ যদি কখনো দেয়, তবে মনে রাখবেন, সে কখনো আপনার বন্ধু নয়। সে পরামর্শে দেশে সমরানলই জ্বলে উঠবে। কিন্তু আপনি সত্য ভঙ্গ না করলে আমরা কখনো যুদ্ধ ঘোষণা করবো না। এইমাত্র খবর পেলাম যে, ফরাসীরা পালিয়ে গিয়ে আপনার কাছে আশ্রয় নিয়েছে এবং আপনার সেনাদলে নিযুক্ত হবার জন্যে আবেদন করেছে। আপনি যদি এতে সম্মত হন– তবে আর আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে না। আপনি সেদিনও আমাদের কাছে সৈন্য সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু তারপরই তা আর চান না বলে লিখেছেন, এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ফরাসীদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনই আপনার উদ্দেশ্য। (Ive's Journal)

পত্র সিরাজদ্দৌলার হস্তগত হলে ইংরেজদের শঠতা তিনি স্পষ্ট বুঝে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন। কিন্তু পত্রের কোন উত্তরই দিলেন না।

ওদিকে পরপর দুটো পত্রের উত্তর না পেয়ে ইংরেজদের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়ে যায়। ফরাসীদেরকে আশ্রয়দানই যে এর একমাত্র কারণ, ইংরেজরা তা বুঝেছিল। এতে তাদের আতঙ্কিত হবারই কথা। কিন্তু বাহ্যত তার প্রকাশ না দেখিয়ে ওয়াট্‌সন আরেকবার কুটিলতার আশ্রয় নিলেন। ফরাসীরাই যত অনিষ্টের মূল– ইংরেজদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথে চরম বাধা; সুতরাং যে কোন উপায়ে ফরাসীদের এদেশ থেকে তাড়াতে হবে, সিরাজ এবং ফরাসীদের মধ্যকার বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে হবে। এ হলো তার কুটিলতার লক্ষ্য ; সুতরাং ওয়াট্‌সনের সুর এবার নামলো। কাকুতি-মিনতি করে তিনি নবাবের কাছে লিখলেন :

চন্দননগরের কাছে আমাদের কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ বাঁধা রয়েছে ; হুগলীর অদূরে কয়েক পল্টন গোরা সৈন্য ছাউনী ফেলেছে,–এজন্যে নাকি আপনি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর এই সুযোগে আমাদের শত্রুরা নাকি আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আমরা সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের মানসেই এসব আয়োজন করছি। কেউ যে এমন জঘন্য মিথ্যা কথা বলে আপনাকে প্রতারিত করার সাহস পেয়েছে, এটাই সমধিক বিস্ময়ের ব্যাপার ! আর আপনি যে এমন ভিত্তিহীন ও কল্পিত খবরও সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন, তা আরো বিস্ময়কর। আপনিও তো একজন বীরপুরুষ, – আপনি বুঝেন না, আপনার রাজ্যে একজন শত্রুসেনা লুকিয়ে থাকা পর্যন্ত তার পিছু না নিয়ে কি করে আমি নিশ্চুপ থাকতে পারি? এটা আমার পক্ষে কতদূর যে ভ্রমাত্মক ব্যাপার হতে পারে তা আর কি বলবো ! সে যাই হোক, আপনি যদি ফরাসীদেরকে বেঁধে পাঠিয়ে দেন, তা হলেই তো সব বিতর্কের অবসান হতে পারে আর আমরাও সৈন্য সামন্ত নিয়ে ফিরে যেতে পারি। যে পর্যন্ত তা না করছেন, সে পর্যন্ত কেমন করে বলবো যে– আপনি ধর্ম-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন? (Ive's Journal)

এ পত্রে ওয়াট্সন্ মিথ্যা, শঠতা এবং ধূর্ততার আশ্রয় নিয়েছেন। কেননা, তিনি যে সময় এই পত্র লিখছেন এবং নবাবকে বোঝানোর প্রয়াস পাচ্ছেন যে, মুর্শিদাবাদ আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার কথা সর্বৈব মিথ্যা, শত্রুদের রটনা ও প্রতারণা এবং এ জন্য ওয়াট্সন্ চরম বিস্ময়ও প্রকাশ করেছেন, ঠিক সে সময়ের কথার উল্লেখ করে স্বয়ং ক্লাইভ বলে গিয়েছেন : চন্দননগর দখল করা মাত্র তিনি সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঐ চন্দননগর পর্যন্ত এসেই তাদের নিরস্ত হলে চলবে না। নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন চন্দননগর অধিকার করা হয়েছে, তখন আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করা হোক।

(Clive's Evidence before the Committee of the House of Commons, First Reports, 1772)

ওয়াট্সনের মুর্শিদাবাদ আক্রমণের কথা অস্বীকার করাটা যেন "ঠাকুর ঘরে কে- আমি কলা খাই নি" এর মতো শোনায়। কেননা, একদিকে নিজেরা মুর্শিদাবাদ আক্রমণের পাঁয়তারা করছেন- অপরদিকে বলছেন যে, আমরা কিছুই জানি না।

সিরাজদ্দৌলা বয়সের দিক থেকে অপরিণত হতে পারেন ; কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি অপরিণত নয়। তাই ইংরেজদের মতিগতি বুঝতে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হয়নি। তবুও তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়, দেশের এবং প্রজাদের মঙ্গলকামী, কর্তব্যে নিষ্ঠ ও প্রতিজ্ঞায় অটল। এরই প্রমাণ পাওয়া যায় ওয়াট্সনের কাছে লেখা তাঁর পরবর্তী পত্রে। সিরাজদ্দৌলা লিখছেন :

> আমি ধর্ম-প্রতিজ্ঞা করে যেসব কথা মেনে নিয়ে আপন হাতে সই করেছি, তা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। কোন বিষয়ে কিছু মাত্র ত্রুটি হবে না। ওয়াট্সন যা যা দাবী করেছে, তা সবই আদায় করেছি ; সামান্য কিছু বাকি আছে, তা-ও বর্তমান চান্দ্রমাসের প্রথম পক্ষ শেষ হওয়া মাত্র শোধ করা হবে। বোধ হয় ওয়াট্স এসব কথা লিখে পাঠিয়েছে। আমার যা কর্তব্য, তা তো পালন করেছি। কিন্তু তোমাদের মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে যে, প্রতিজ্ঞা পালন করা দূরে থাক, বরং তা বিলীন করাই তোমাদের অভিপ্রেত। তোমাদের ফৌজের উৎপাতে হুগলী, ইঙ্গিলি, বর্ধমান এবং নদীয়া উৎসন্নে যেতে বসেছে। -এ উপদ্রব কেন? গোবিন্দরাম মিত্র রামদেবের পুত্রকে দিয়ে নন্দকুমারের কাছে লিখে পাঠিয়েছে যে, কালীঘাট নাকি কোলকাতার জমিদারীভুক্ত, তাই সে এর দখল দাবী করেছে। এ কথার অর্থ কি? তোমার অজ্ঞাতসারেই যে এসব ঘটেছে, তা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি সন্ধিপত্রে সই করেছ, বলে কেবল তোমার বিশ্বাসেই আমি সন্ধি করতে রাজী হয়েছিলাম। যদি সন্ধি না হতো, তবে উভয় পক্ষের সৈন্যদের তুমুল সংঘর্ষে দেশের সর্বনাশ ঘটতো, প্রজাপুঞ্জ পদদলিত হতো, রাজকর বরবাদ হয়ে যেতো, রাজ্যে সমূহ

অমঙ্গল দেখা দিত। এসব নিবারণের জন্যেই তো সন্ধি করেছিলাম। আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব অঙ্কুরিত হয়েছে, তা দৃঢ় ও মজবুত করাই কর্তব্য। এতে কোনরূপ দ্বিধা-সন্দেহ না থাকলে এসব উৎপাত নিবারণ করে মিত্রকে বলবো সে যেন ভবিষ্যতে আর কখনো এমন মিথ্যা প্রবঞ্চনাময় অলীক প্রস্তাব উপস্থিত না করে। আর এক কথা। এইমাত্র শুনলাম যে, ফরাসীরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দাক্ষিণাত্য থেকে সেনাদল পাঠিয়েছে। তারা যদি আমার অধিকারে যুদ্ধ বাধাতে চায়, আমাকে লেখামাত্র আমি সিপাহী পাঠিয়ে তাদেরকে নিরস্ত করতে কোনরূপ কসুর করবো না, লিখামাত্র আমার সিপাহী সেনারা অগ্রসর হবে। (Ive's Journal)

নবাব নিজে শান্তির জন্য ব্যাকুল আর কুচক্রী পাত্রমিত্রগণ তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করতে পাগল। তারা নবাবকে বোঝালো, "ফরাসীরা আপনার আশ্রয়ে থাকলেই সন্ধিভঙ্গের আশঙ্কা।" সিরাজও তা মেনে নেন। তিনি ফরাসী সেনাপতি মশিয়ে লা'-কে ডেকে আনেন এবং দলবল নিয়ে তাঁকে পাটনায় চলে যেতে নির্দেশ দেন। মশিয়ে লা' অল্পদিন মাত্র মুর্শিদাবাদে ছিলেন। এ সময়ের মধ্যেই তিনি নবাবের পাত্রমিত্রগণের সব ভাব-সাব বুঝে ফেলেন। তিনি নবাবকে বলেন– তাঁর (নবাবের) মন্ত্রীদল এবং অধিকাংশ সেনাপতি ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার আয়োজন করছে। ফরাসীদের ভয়েই শুধু প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত হতে সাহস পাচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে ফরাসীদেরকে রাজধানী থেকে বিদায় দিলেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।"

কিন্তু নবাব শান্তি চান। তাই সব জেনেশুনেও তাঁকে বলতে হয়েছিল, –'আপনারা ভাগলপুর এলাকায়ই থাকবেন, বিদ্রোহের সূচনা বুঝলেই খবর পাঠাবো।" মশিয়ে লা' আর দ্বিরুক্তি করেননি। কেবল বিদায় বেলায় অশ্রুভরা চোখে শেষবারের মত বলে যান,– "আমি জানি এই শেষ দেখা–আর কখনো আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হবে না।" (Stewart's History of Bengal)। সত্যি তাঁদের মধ্যে আর দেখা হয়নি।

ফরাসীদেরকে বিদায় দিয়ে শান্তিকামী নবাব ওয়াট্‌সনকে ১৭৫৭ সালের ১৪ই এপ্রিল লিখেন :

> I have written before and now repeat that if the English Company want to establish their trade do not write me what is not comfortable to our agreement by the instigation of self-interested and designing men who want to break the peace between us. If you are not disposed to come to a rupture with me you have my agreement under my hand and seal, when write, look upon that and write accordingly.

অর্থাৎ স্বার্থান্বেষী লোকদের উত্তেজনায় ভুলে যেও না, সন্ধি ভঙ্গ করাই তো এদের উদ্দেশ্য এবং শান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতেই চায়। যদি আমার সঙ্গে কলহ বিবাদ বুদ্ধি করার প্রবৃত্তি না থাকে, তবে আর আমাকে সন্ধিবিরোধী কোন প্রস্তাব লিখবে না। বরং লেখার পূর্বে সন্ধিপত্রখানি আর একবার পড়ে দেখবে এবং সে অনুযায়ী লিখবে।

কিন্তু গোল বাধালো ইংরেজরা। পাটনা চলে যাওয়ার সময় তারা পথিমধ্যে অসহায় ফরাসীদেরকে আক্রমণের আয়োজন করলো। খবর পেয়ে নবাব ভীষণভাবে রেগে গেলেন। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে তিনি ফরাসীদের পিছু নেওয়া চলবে না- এই মর্মে ওয়াট্‌সন্‌কে মুচলেকা লিখে দিতে, না হয় রাজধানী থেকে বের হয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।

এ খবর শুনে ইংরেজদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। এরপর ওয়াট্‌সন সিরাজদ্দৌলার নিকট পত্র লিখলেন- এটাই নবাবের কাছে লেখা তাঁর শেষ পত্র। এবার তিনি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। নবাবকে লিখে পাঠালেন :

একজন মাত্র ফরাসী বেঁচে থাকতেও ইংরেজ নিবৃত্ত হবে না। তারা শীঘ্রই কাশিমবাজারে সেনা পাঠাচ্ছেন। কাশিমবাজার সুরক্ষিত হলে ফরাসীদেরকে বেঁধে আনার জন্য পাটনায় আরো দু'হাজার ফৌজ পাঠানো হবে। এসব কাজে নবাবকে ইংরেজের সহায়তা করতে হবে।

পত্রের শেষে ওয়াট্‌সন নিজের সাধুতা প্রকাশ করতেও ত্রুটি করেননি। লিখেছেন :

Let me again repeat to you I have no other views than that of peace. The gathering together of richers is what I despise." (Watson's Letter)

অর্থাৎ শান্তির জন্যই আমার যত ব্যাকুলতা। তা ছাড়া আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। ধনের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে স্থান পেতে পারে না। আমি তা মনে-প্রাণে ঘৃণা করি।

নবাব সিরাজদ্দৌলা দেখলেন শান্তি আর রক্ষা করা গেল না। ভাবলেন, যুদ্ধ বুঝি এই শুরু হয়ে গেলো। সুতরাং তিনি আত্মরক্ষার আয়োজন করতে লাগলেন।

অপরদিকে নবাবের পাত্রমিত্র এবং ইংরেজগণ হীন স্বার্থ হাসিলের জন্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই একাত্ম হয়ে উঠলেন। সিরাজকে সিংহাসন থেকে সরানোর ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। গোপন সলা-পরামর্শ শুরু হয়ে গেল।

১৭ই মে কোলকাতার ইংরাজ দরবারে এই গুপ্ত সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলিপির আলোচনা হইল। এই পাণ্ডুলিপিতে কোম্পানী বাহাদুর এক কোটি টাকা ; কোলকাতাবাসী ইংরাজ বাঙ্গালী ও আরমানীগণ ৭০ লক্ষ টাকা এবং উমিচাঁদ ৩৩ লক্ষ টাকা পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া যাঁহারা বিদ্রোহের প্রধান প্রধান পাণ্ডা, তাঁহাদের

পুরস্কারের অঙ্ক এক পৃথক ফর্দে লিখিত হইয়াছিল। সিরাজদ্দৌলার রাজভাণ্ডারে অবশ্যই এত টাকা থাকিবার কথা নহে ; কিন্তু সে কথার কেউ বিচার করলেন না। চারিদিকে রাজবিপ্লব– ইংরাজেরা কাণ্ডারী সাজিয়ে মীরজাফরের আশার তরণী তীরসংলগ্ন করিতে প্রতিশ্রুত, – সুতরাং তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন, মীরজাফরকে তাহাতেই 'তথাস্তু' বলিতে হইয়াছিল।

(অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়- সিরাজদ্দৌলা ; পৃ. ৩২৮–২৯)

এই সন্ধিপত্র নিয়ে ওয়াট্‌স বোরকা পরিহিতা রমণীর বেশে মীরজাফরের অন্তপুরে গিয়ে পৌঁছলেন। মীরজাফর পবিত্র কুরআন মাথায় নিয়ে, প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরনের মাথায় বাম হাত রেখে, ডান হাতে কলম ধরে স্বাক্ষর করলেন– "আল্লাহ এবং পয়গম্বরের দোহাই দিয়ে শপথ করছি, যতক্ষণ প্রাণ থাকে এই সন্ধিপত্রের অঙ্গীকার পালন করতে বাধ্য থাকলাম।"

নবাব অগৌণে এই গোপন সন্ধিপত্রের খবর পেয়ে গেলেন এবং মীরজাফরকে গ্রেফতারের আয়োজন করতে লাগলেন। তবে তাঁকে গ্রেফতার করা তত সহজ ছিল না। ওয়াট্‌স্ সব টের পেয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যান। এরপর নবাবের আর কোনই সন্দেহ রইলো না। সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াট্‌সন্‌কে পত্র লিখলেন। এটাই ছিল সুবে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবের শেষ পত্র। নবাব লিখলেন :

25th Ramzan (13th of June, 1757)

According to my promises and the agreement made between us, I have duly rendered everything to Mr. Watts except very small remainder and that almost settled Manikchand's affair. Not withstanding all this Mr. Watts and the rest of the Council of the factory at the Cassimbazar, under pretence of giving to take the air in their gardens, fled away in the night. This is an evident mark of deceit and of an intention to break the treaty. I am convinced it could not have happened without your knowledge or without your advice. I all along expected something of this kind and for that reason I would not recall my forces from Plassey, expecting some treachery.

I praise God that the breach of the treaty has not been on my part. God and his Prophet have been witnesses to the contract made between us and whoever first deviates from it will bring upon themselves the punishment due to their actions.

(Ive's Journal)

**পত্রটির বাংলা অনুবাদ :**

২৫শে রমজান (১৩ই জুন, ১৭৫৭)

আমার অঙ্গীকার এবং আমাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সন্ধি অনুযায়ী আমি ওয়াট্স্‌কে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছি। তবে খুবই সামান্য কিছু বাকী থাকতে পারে। মানিকচাঁদের ব্যাপারও একরূপ শেষ করেছিলাম। কিন্তু এতে করেও কোন ফল হলো না। ওয়াট্স্ এবং কাশিমবাজারের কুঠিয়ালেরা তাদের বাগানে বায়ু সেবনের ভান করে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গিয়েছে। এটা প্রতারণার সুস্পষ্ট আলামত এবং সন্ধিভঙ্গের পূর্বসূচনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার অজ্ঞাতসারে কিংবা বিনাপরামর্শে এ কাজ সংঘটিত হতে পারে না। এরূপ ঘটবে বলে চিরদিনই আশংকা করতাম এবং একমাত্র এ কারণেই তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার আশংকায় আমি পলাশী থেকে আমার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে আনতে রাজী হতাম না।

যা হোক, আমার দ্বারা সন্ধিভঙ্গ হয়নি বলে মহান আল্লাহ্‌র কাছে শোক্‌রিয়া। আমাদের মধ্যে যে চুক্তি ও ওয়াদা-অঙ্গীকার হয়েছিল– আল্লাহ এবং তাঁর নবী তার সাক্ষী। যিনি প্রথমে ওয়াদা ভঙ্গ করবেন, তিনিই সেই মহাপাপের শাস্তি ভোগ করবেন।

এখানে ক্লাইভের এই ওয়াদাপত্রের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি। আলিনগরের সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর সিরাজদ্দৌলার সন্তুষ্টির জন্যে ক্লাইভ একটি ওয়াদাপত্রে স্বাক্ষরদান করেছিলেন। এতে ক্লাইভ এরূপ ওয়াদা করেছিলেন :

I Colonel Clive, Sabut Jung Bahadur, Commander of the English Land-Forces in Bengal do solemnly declare in presence of God and our saviour, that there is peace between the Nabab Seerajah Dowla and the English. They, the English will inviolably adhere to the Articles of the Treaty made with the Nabab. That as long as he shall observe his agreement the English will always look upon his enemies as their enemies and whenever called upon will grant him all the assistance in their power. — 12 February, 1757".

(Treaties, Engagements and Sunnuds— Vol. 1. 10)

আমি বাংলায় অবস্থিত ইংরেজ স্থল-বাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল ক্লাইভ, 'সাবুদ্ জঙ্গ বাহাদুর' প্রভু এবং আমাদের উদ্ধারকর্তা (যীশুখৃষ্ট)-কে হাযির-নাযির জেনে ওয়াদাপূর্বক ঘোষণা করছি যে, নবাব সিরাজদ্দৌলা এবং ইংরেজের মধ্যে শান্তি বিরাজ করছে। নবাবের সঙ্গে যে মর্মে সন্ধি হয়েছে, ইংরেজরা তার মর্যাদা একান্তভাবে রক্ষা করবেন। নবাব যতদিন সন্ধি রক্ষা করবেন, ইংরেজরা ততদিন

নবাবের শত্রুকে নিজেদের শত্রু বলে মনে করবেন এবং নবাব যখন চাইবেন, তখনই তাঁকে তাঁদের শক্তি অনুযায়ী সাহায্য করবেন। –১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।”

বলা বাহুল্য, ইংরেজরা এই ওয়াদার কতটুকু রক্ষা করেছে– পূর্বের আলোচনায় তা বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। নবাব সন্ধি রক্ষা করতে কতটুকু যত্নবান ছিলেন– তা-ও বলার অপেক্ষা রাখে না। “মুখে শেখ ফরিদ, বুকে ইট” নীতি ইংরেজদের সব সময়ই ছিল। উপরে তারা সাধু বেশে আস্ত শয়তানেরই ভূমিকা পালন করেছে। যতবার তারা ওয়াদা করেছে তার প্রত্যেকবারই তারা তা ভঙ্গ করেছে। বাইরে নবাবের সঙ্গে মিত্রতার ভান করেছে আর তলে তলে নিজেদের শক্তি বাড়িয়েছে ও নবাবের পাত্রমিত্রদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। এই হলো তাদের সততার, ধর্মের উপর ভক্তি এবং ওয়াদা রক্ষার নমুনা।

ভেতরে-বাইরে শঠতা আর ষড়যন্ত্র, নবাব দিশেহারা, ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য, দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন, দেশের হিতাকাঙ্ক্ষীরা উদ্বিগ্ন, স্বার্থান্বেষীরা উল্লসিত– এমনি অসহায় অবস্থায় মীরজাফরকে বিপক্ষ না করে স্বপক্ষে টেনে আনাই বুদ্ধিমানের কাজ– এই ধারণা নিয়েই সিরাজদ্দৌলা ১৫ই জুন মীরজাফরের প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হন। জাফরগঞ্জের সেনা ও সেনানায়কগণ ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠেন। সসম্মানে তারা নবাবকে অভিবাদন জানান। মীরজাফর সলজ্জ নয়নে অধোবদনে সিরাজের সামনে আসেন। নবাব তার সকল পূর্ব অপরাধ মাফ করে দেন এবং আল্লাহ্‌র নামে, রসূলের নামে আর সাথে সাথে আলিবর্দীর নামে, দেশের স্বাধীনতার নামে এবং আত্মীয়তার নামে মীরজাফরকে নিজের দিকে ডাকেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁকে সহায়তার জন্য আহ্বান জানান। মীর জাফর এবারও পবিত্র কুরআন মাথায় নিয়ে সিরাজের সামনে জানু পেতে ওয়াদা করেন, “আল্লাহ্‌র নামে, রসূলের নামে, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যাবজ্জীবন মুসলমানের সিংহাসনের হেফাজত করবো, জান থাকতে বে-দীন ফিরিঙ্গীর সহায়তা করবো না। এতে সিরাজদ্দৌলার সকল সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

মীরজাফর এই ওয়াদা কতটুকু রক্ষা করেছিল– পরবর্তী ইতিহাসই তার সাক্ষী। পলাশীর যুদ্ধে তারই বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের পতন হয়। ইংরেজরা দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব দখল করে, আর এদেশবাসী স্বাধীনতা হারায়।

পলাশী যুদ্ধে চরম বিপর্যয়ের পর নবাব মহিষী লুৎফুন্নিসার হাত ধরে পালিয়ে যান। কিন্তু পথে ধৃত হয়ে জাফরগঞ্জের রাজপ্রাসাদে একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কারারুদ্ধ হন।

এই রাজপ্রাসাদই একদিন নবাবের আগমনে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠেছিল, সেনা আর সেনানায়করা এখানে নবাবের প্রতি সম্মান দেখিয়েছিল এবং মীরজাফর সিরাজের সামনে নতজানু হয়ে কুরআন শপথ করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার এবং ইংরেজের সহায়তা না

করার ওয়াদা করেছিলেন। আর পরবর্তী পর্যায়ে সেই প্রাসাদেই নবাব সিরাজ স্বয়ং বন্দী। চারিদিকে কুটিল অট্টহাসি।

সকল কুচক্রীদের মন্ত্রণাসভায় নবাব সিরাজকে হত্যারই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু কে করবে তাঁকে হত্যা ? অবশেষে আজীবন নবাব আলিবর্দী এবং নবাব সিরাজের অন্নে প্রতিপালিত মুহাম্মদী বেগই এ কুকর্মের জন্য এগিয়ে আসে। তার হাতে উন্মুক্ত খড়্গ দেখে সিরাজ সব বুঝে ফেলেছিলেন। মুহাম্মদী বেগকে বললেন ঃ এসো– একটু থামো একটু থামো– পানি দাও একবার আল্লাহ্‌র নিকট মোনাজাত করি। এ জীবনের শেষ কর্তব্য দু'রাকায়াত নামায পড়ে নিই। (Orme,—ii, 184)

দুরাত্মা দু'রাকায়াত নামায শেষ করতেও দেয়নি তাঁকে। প্রচণ্ডবেগে সিরাজের কাঁধে খড়গাঘাত করতে করতে তাঁর দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিল, সিরাজের জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দুশো বছরের জন্য ভারতের স্বাধীনতা-সূর্যও ডুবে গিয়েছিল।

এরপরও দুরাত্মারা নবাব সিরাজের ক্ষতবিক্ষত লাশকে পর্যন্ত রেহাই দেয়নি। তারা লাশ হাতীর পিঠে করে নগর প্রদক্ষিণে বের হয়। লোকে লোকারণ্য রাজপথ এ দৃশ্যে চারিদিকে হাহাকার রব ওঠে। অন্দর মহলেও এ খবর গিয়ে পৌছায়। সিরাজ-জননী আমিনা বেগম হায় হায় করতে থাকেন এবং শেষে রাজপথে এসে ধুলায় লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে দেখে লাশবাহী হাতী হতভম্ব হয়ে বসে পড়েছিল। স্নেহময়ী জননী সন্তানের লাশ বুকে ধরে মূর্ছা গেলে মীরজাফরের অনুচররা জোর করে জননীর বুক থেকে সন্তানের লাশ ছিনিয়ে আনে এবং তাকে বন্দী করে। নবাবের লাশ পরে অবশ্য তাঁর মাতামহ আলিবর্দীর কবরের পাশেই দাফন করা হয়েছিল। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মনসুর-উল-মুলক সিরাজদ্দৌলা শাহকুলী খাঁ, মীরজা মোহাম্মদ হায়বৎ জঙ্গ বাহাদুর এ ভাবে অন্তিম শয়ানে শায়িত হন।

যা হোক, সুবে বাঙলার স্বাধীন নবাব সিরাজের শুরু থেকে শেষ পুরো আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, অন্ধকূপ-হত্যা সম্পূর্ণ অলীক ও কল্পিত ঘটনা। নবাব সিরাজ কখনো ওয়াদা খেলাফ করেননি, বরং ইংরেজরাই বারবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। নবাব সিরাজদ্দৌলা একজন ন্যায়পরায়ণ দেশদরদী, শান্তিপ্রিয়, স্বাধীনচেতা, বিচক্ষণ, জনগণের কল্যাণকামী, কর্মঠ এবং বীর নরপতি ছিলেন। স্বার্থান্বেষী পাত্রমিত্র, অর্থলোভী কর্মচারী এবং দেশী পুঁজিপতিদের বিশ্বাসঘাতকতা আর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রেই সিরাজের পতন ঘটেছিল। নিজেদের অপকর্ম চাপা দেয়া, সিরাজকে কলংকিত করা এবং নিজেদের পাঠ্য ষড়যন্ত্রের বৈধতা প্রমাণের জন্যই ইংরেজরা এই অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনী রচনা করেছিল।

আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি। অনেক কোরবানীর বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ করেছি। কিন্তু আমাদের শত্রুদের সেই পুরনো ষড়যন্ত্র এখনো থামেনি। দ্বিধাদ্বন্দ্ব এখনো ঘুচেনি ; নিজেদের মধ্যে আজো চলছে দলাদলি ও স্বার্থের হানাহানি। এখন ইংরেজের সেদিন আর নেই। তাই তার স্থান নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদের দোসররা এবং তাদের পোষ্য পুত্র দেশী বিদেশী দালাল এ যুগের মীরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠরা। আমাদের বিরুদ্ধে অহরহ ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে তারা। রাজনৈতিক আযাদীর চেয়ে মানসিক আযাদীর মূল্য বেশী। আর এটা এখনো আমাদের মধ্যে হাসিল হয়নি। মানসিক গোলামীও পরোক্ষ গোলামী। তাই আজ সময় এসেছে সুবে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণের এবং সকল সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়ার।

---

ইফা-২০০৯-২০১০-প্র/২৫৬২(উ)-৩২৫০